কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

বাহান্ন বর্ষ, শারদীয়া, ১৪২৬



মাগো তোমার চোখের আলোয় আমি শুদ্ধ হই।
আমি শুদ্ধ হই জননী, আমি স্নিগ্ধ হই॥

কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

বাহান্ন বর্ষ, শারদীয়া ১৪২৬

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
krishanupatrika@gmail.com

কৃশানু

বাহান্ন বর্ষ, শারদীয়া ১৪২৬

সম্পাদক : মনন দাস

সূচীপত্র

ইলাস্ট্রেশান	**কম্পিউটার গ্রাফিক্স**	**প্রচার ও জনসংযোগ**
শৈলেন পাত্র	প্রদীপ মণ্ডল	ডাঃ সমীর কুমার বেতাল

সম্পাদকীয়—

মাঠে বিরল কেশের মতো কাশফুল। তবু আপনিই ফোটে। হয়তো একদিন এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পথের পাঁচালির সেই চিত্ররূপ—সেই কাশবন সেই অপু-দূর্গার ছুটোছুটি ওটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবে বাঙালীর পরবর্তী প্রজন্ম। শরৎ ঋতু সর্বত্র আসে না, যেমন করে আসে এই বাঙলায়।

পদ্ম! যদিও ব্যবসার খাতিরে যত্ন পায়, চাষও হয়, কিন্তু পরিবেশ তেমন করে গড়ে তুলতে পারে না পদ্ম। অনেক ছোট হয়ে গেছে আকারে। তবুও সবুজ এই বাঙলাকে রক্ষা করার জন্য চাই বৃক্ষরোপন। মন দিতে হবে সাধ্যমত সবুজায়নে। যেখানে যতটুকু জায়গা আছে বৃক্ষরোপন করতে হবে।

স্বাধীনতা + দেশভাগ + দাঙ্গা = এই নিয়ে বাঙলা। স্বাধীনতার জন্য যাদের এমন করে জীবন, ধন, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, ইজ্জত দিতে হয়নি। তারা কি করে বুঝবে এ যন্ত্রণা। তাই তারা যা খুশী তাই বলতে পারে। নিঃসম্বল হয়ে শুধু প্রাণটুকু হাতে নিয়ে পালিয়ে একটু আশ্রয়ের জন্য যারা পাড়ি দিয়েছিল তাদের জন্য প্রাণ কাঁদবে কেন?

এইটুকু পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের কয়েক কোটি মানুষের আশ্রয়স্থল, তাদের নিয়েই চলেছে বাঙালী। তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়েই বাঙালীর দুর্গোৎসব।

একটি উৎসবকে উপলক্ষ্য করে সাহিত্য চর্চার এই বিপুল আয়োজন ভারতে তথা সারা বিশ্বে কোথাও নেই। কৃশানুর শারদীয়া সংখ্যার এত লেখা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে জীবন খুঁজে পাই। এক একটি কবিতা ধারাল অস্ত্রের মতো, এক একটি কবিতা প্রস্ফুটিত ফুলের মতো, এক একটি কবিতায় বুকে মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা, এভাবে শত অনুভবে বিকশিত বাংলা ভাষা।

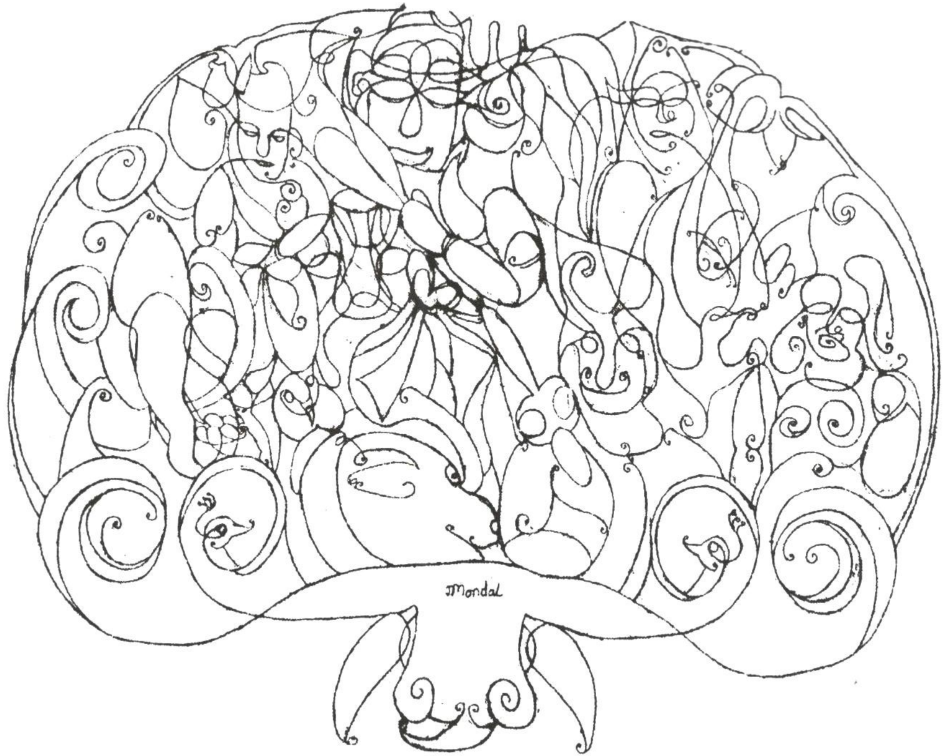
পৃথিবীর মানুষের বিচারে শ্রেষ্ঠ মিষ্ট ভাষা বাঙলা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বাঙলার জন্য আমরা গর্বিত।

জয় বাঙলা ভাষার জয়।

মনন দাস
সম্পাদক



স্কেচ - ফরিদা খাতুন



স্কেচ - দীপকুমার

বকুল ও বিষাদ ■ রথীন কর

আমার ব্যক্তিগত
বাগানে
ফুল
অগণিত
এটা গোলাপ
এটা ভালবাসবে
এটা জবা
পুজোর জন্যে
মায়ের পায়ে।

অবিশ্বাসী হাওয়ায়
সমূহ বকুল
ঝরে পড়ে
এগুলি তুলে নেব আঁজলা
ভরে আমার বকুলের জন্যে
মল্লিকা মালতী সব ম্লান
হয়ে যাবে ঝরা বকুলের গন্ধে

ধরণীর রমণীয় ফুলগুলি
শুকিয়ে যায়
শান বাঁধানো রোদ্দুরে
জীর্ণ অশোক কাঁদছে
জনকোলাহলের শূন্যতায়

হাওয়ায় আমিষ গন্ধ
বাতাসে অবিশ্বাসী শব্দ

বিষাদের বয়স বাড়ছে...



শাব্দিক নটরাজ ■ জেবুননেসা হেলেন

তিথি দেখে তুমি
শব্দের সংগে সখ্য
গড়তে চেয়েছো।

যে শব্দের আলিঙ্গনে
উঠোনে উঠোনে ঝড় উঠবে
ঝরাপাতাগুলো প্রাণ পেয়ে
উড়ে যাবে দূরে।

মরুর বালিতে কান পেতে
শুনবে সূর্যতাপ
কৈশিক বালি থেকে কিভাবে
শুষে নেয় শেষ জলকণা!

করতলে চোখ রগড়ে
দৃষ্টি স্বচ্ছ করে দেখতে
চেয়েছো দিগন্তের সীমানা!

নাড়ার অনলে ভুট্টার শরীর পুড়িয়ে
খাদ্য-শব্দে গড়তে চেয়েছো
কালজয়ী কবিতা।

কবিতার ঘরে লুটিয়ে পড়েছে,
দিনে সূর্য রাতে জ্যোৎস্না।

তেঁতুল জলে গুলিয়ে কমাতে
চেয়েছো হৃদ-পেশির
সিস্টোল-ডায়াস্টোল!

যা কিছুই করো
২০ থেকে ২০,০০০ ডি বি-র বেশি
শব্দ কিন্তু তুমি শুনতে পাবে না।

কবিতার মতো হাসে শ্যামরাই ■ শান্ত রায়

নিবন্ধ কেউ ফাঁদে কবিতায়,
ছাপা হয়ে যায় এখানে ওখানে
আবার, কেউ বা স্রেফ সংবাদ
সাজিয়ে চালায় কবিতার নামে!

রাশিরাশি যত এলেমদারেরা,
এছাড়া, কত যে ডাকাবুকোজন
এবং প্রভাব প্রতিপত্তির
উঁচু চূড়া থেকে নেমে এসে সোজা,
'কবিতা' শোনায়, বক্তব্যের
জায়গা যেন-বা বেচারি কবিতা!

কবিতা কারো-বা হাতিয়ার, আর
ওপরে ওঠার সিঁড়ি কারো- কারো;
ভণ্ড প্রেমিক কবিতায় কেঁদে,
ফোয়ারা ছোটায় মানবিকতার

কবিতা মানে তো, জীবনানন্দ;
কবিতা মানে যে, রবীন্দ্রনাথ!
দুঃখের শেষ আছে কি কবির,
কবিতাকে ভালোবেসে দিনরাত?

কবিতা যখন আসে, তাকে ধ'রে
না রাখলে, ফের না-ও আসতে পারে
ঠিক ওই রূপে...জানে তা ক'জন!
কবিতা, তোমার ক'জন স্বজন?
জগঝম্পের আড়ালে-আড়ালে
কতকিছু আজ হচ্ছে জবাই!
লিখতে কবিতা জানে কি সবাই?

'আমরাও লিখি' বলতে বলতে
ছুটে আসে ওই জগাই-নবাই—
ঝুলন-দোলায় কবিতার মতো
মুচকি-মুচকি হাসে শ্যামরাই...

অনন্তকাল
দোলে শ্যামরাই!



প্রতিফলন ■ কাকলি চট্টোপাধ্যায়

কলম আমার দুখের দোসর
আনন্দের নয়
বুকের লাভার উথাল-পাথাল
ভুমিকম্প হয়
চলকে পড়ে ছলকে ঝরে
অলিন্দ নিলয়
কবিতার নেই স্বাধীনতা
ছন্দ বেঁধেও ভয়
ওই রক্তেই লেখা তবু
কতো আশার গান
রাম-রাজ তো শুরু হলো
কোথায় এলো রাম
তল পেতে সব অতলেতে
যাই হারিয়ে চল
আঁধার শেষে রবির উদয়
ভয়টা কিসের বল?
জীবন খোঁজে মরণ যদি
অসময়ে আসে
তাতেই বা আর শোক কিসের
আগামী তো হাসে!

নৈঃশব্দের ঈশ্বরকে ■ ধ্রুব বসু

কবি ঈশ্বরের থেকেও বড়।
কেননা ঈশ্বর মানুষের
সব কিছু কেড়ে নিতে পারেন
কিন্তু স্বপ্নকে কেড়ে নিতে পারেন না।
ঈশ্বরের বিধানে অরণ্য নগ্ন হয়,
কিন্তু কবির বিধানে
সেখানে আবার ফুলফোটে
ঈশ্বরের বিধানে নীলাম্বর নীল
ভয়াল মেঘবর্ণ ধারণ করে,
কিন্তু কবির বিধানে সেখানে আবার
লজ্জাশীল সমীরণ বয়;
ঈশ্বরের বিধানে কিশোরী অসূর্যম্পশ্যা হয়,
কিন্তু কবির বিধানে তার হিমবন্ত মুখে
রাঙা হাসি ফোটে;
ঈশ্বরের বিধানে সৃষ্টির প্রলয় আছে
কিন্তু কবির বিধানে আছে তার
শুধু সুন্দর সুন্দরতর রূপ।

হে নৈঃশব্দের ঈশ্বর—
কবিকে আর অভিশপ্ত না করে
তুমি একবার পরমানন্দময় হও।



বৃথা ■ সর্বেশ্বর জানা



চক্ষে আমার নিদ্রা যখন, নিদ্রা আমার মনে,
বক্ষে আমার দুঃখ যখন, দুঃখ আমার সনে।
রুক্ষ আমার স্বভাব যদি, কপাল আমার মন্দ।
রৌদ্র আমার সঙ্গী হলে, ভাঙ্গবে মোদের ছন্দ।
কুসুম যদি ভাল বাসি, কীট ও মেনে নেব।
সুরে যদি মাততে পারি, অর্থ বুঝিয়ে দেব।
শোক যদি দগ্ধ করে, রুদ্ধ করে মন,
অর্থ যদি ব্যর্থ হয়, উন্মত্ত এ জীবন।
চক্ষে যদি নিদ্রা আসে, বন্ধ আমার মন।

মায়াময় করে তোল ■ অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়



কোন সে শ্রমণ আজও বোধিবৃক্ষের পাদদেশে
স্থাণুবৎ বসে আছে মৈত্রীর বিমুগ্ধ আবেশে
একটি মানুষ তার স্থিতধী প্রজ্ঞায় ছেড়েছিল
গৃহ, শিশু, কাঙ্ক্ষা আর যুবতী বণিতা
একটি মানুষ যেন কেঁদেছিল তির তির
জরা ব্যাধি মৃত্যুর কবলে পড়া
আর সব মানুষের তীব্র বেদনায়
তাঁর সেই ভালোবাসা সমানুভূতির তীব্র স্মৃতি
নিঃশেষিত মনে হয় একবিংশ শতাব্দীর বিক্ষত প্রহরে

কী ভাবে ঘাতক আজ মারণ খেলায় ধেয়ে যায়
শাণিত অস্ত্রহাতে সদর্প হুঙ্কারে
ভাই বন্ধু পরিজন প্রত্যেকের রক্তের লিপ্সায়

অমিতাভ—জেগে ওঠো পুনর্বার—শান্তিবার্তা নিয়ে এসো
মায়াময় করে তোল ঊষর এ ভূখণ্ডের প্রতিটি প্রান্তর।

তাক না তেজিবোঁ আর জরমে ■ ত্রিস্তান আনন্দ

ক্ষুধা সে জঠর হোক যৌনতা হোক
প্রেম পরমার্থ নয় কাব্য বা শিল্প নয়
সকলেই হতে চায় অজেয় পরাৎপর
কৌপিন আর অন্তর্বাস খুলে গেলে
মরাগাঙ আর মৃত ঢোঁড়াসাপ দেখি



ফুলের গর্ভকেশরে পরাগ ছড়িয়ে
মধুখেয়ে উড়ে যায় ভ্রমর কোথাও
প্রেমিকার দরজায় সাবেকি ছায়ায়
কড়া নাড়ে স্বরাগে প্রেমিক প্রবর

পুরুষের বীর্যবিক্রম জ্ঞানের অধিক
শাস্ত্রকলা ব্যতীত লীলা ধর্ষকাম সমান
জীবনে ভোলেনা কোনো দেহবিনোদিনী
মাধুর্য পরাক্রান্ত প্রথম ধানুকীর নাম।

নাছোড় স্মৃতির কামড় ■ দেবকুমার দত্ত

পাখি তো দিগন্ত ছোঁয়া ডানা মেলে ওড়ে
চেনাশোনা হয় দিক-বিদিক। ইতস্তত স্মৃতি যায় ফেলে
হাওয়ার গভীরে
তৃষ্ণার্ত মরুভূমির বুকের উপর।
স্নিগ্ধ জলাশয়ে। বিশ্বস্ত আতস কাচের স্বচ্ছতায় দোলে।

মানুষ বাঘের মতো নিজের বিচরণ বলয়
সুচিহ্নিত রাখে। জানে—বাইরে পা ফেলার
সমূহ বিপদ প্রলয়।



সময় সময়
স্মৃতির কড়ি হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই
কালের কবল থেকে। স্মৃতি নাছোড়
থাবা বসায়। সত্তা মুখ লুকিয়ে কাঁদে।
কামড় দেয়। অস্তিত্বের যত্রতত্র
ক্ষত হয়, ক্ষতি হয়। রক্ত ঝরে।
উপায় নেই সরিয়ে রাখার আলগোছে।
স্মৃতি তো আমারই প্রায় সমবয়সী
কখনো উদাস ভয়ার্ত সাহসী হতাশ বা প্রত্যাশী।

গোলাপ মেয়ের গন্ধ ■ অঙ্কিত রায়



একটা পাগল গোলাপ ভেবে
বারান্দায় হেলেঞ্চা চারা লাগিয়েছিল,
অসংখ্য আনুগত্যের মাথারা
"একদিন ভালো হবে" চীৎকারে
উপড়ে ফেলল 'বিষকন্যা'।
ঘোড়ার আড়াই পা উঠোন জুড়ে
তারপর নিরুপদ্রব অন্ধকার।

এই দেখে তুমি বললে, "কি সুন্দর বেঁচে আছি"
আমি মনে মনে ভাবলাম
তুমি জানোই না গোলাপ মেয়ের গন্ধ!

বউ ■ আবদুল্লাহ আল রিপন

সন্ধ্যায় সামনে এসে
গাল পেতে বলে বউ, 'পান'।

লজ্জাবতী লাজুক ভাঁজ করা পান
লজ্জায় গলে যাবে গালের ভেতর
লালার সুগন্ধ পেয়ে।
সবুজ অথচ ভীষণ লাল হয়ে যাবে।
লাল হয়ে যাবে গাল
সেই লাল, জলছাপ হয়ে
লালের জলোচ্ছ্বাসে খেলবে কানামাছি
পায়ের আঙুল থেকে কপাল অবধি।

চোখ খোলে বউ
আঙুল খোলে স্বামী।

আঙুলের ভেতর অনিদ্রার অসুখ
চোখের ভেতর সুখের শরাব!
মাঝখানে এক খিলি পান।
খয়ের নেই, সুপারি নেই।
ভেতরে এক বিষের পুর।

গাল পেতে বলে বউ 'পান'।
ধানশিল্পী স্বামী তার বলে
'চোখ খুলবে না। হাঁ করো দেখি
রসের সমুদ্র জমে গেলে গালে
রক্তের শরাব ঢেলে দিও
আমার ভেতরে চুমুকে চুম্বনে।'



থেমে থেকে বলে বউ,
'ধানে আর উঠলো না দাম?

আমি না হয় শরীর বিকোতাম?'

কবিতা পথিক : কবি বিনয় মজুমদারকে মনে করে ■ তেজেশ অধিকারী



পাতা ঝরার গানে ব্যথার কুসুম ঝরে যায়—
বিদ্যুতের গর্ভ থেকে তবু আসে রক্তিম আকাশ
বস্তুত ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ উড়ান সারস ডানায়।

হারানো অঙ্কের খোঁজে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ
রথ চক্র, জয় দ্বন্দ্ব-পরাজয়-জয়, চিরন্তন বাঁশির
অপরাজেয় দৃঢ় আকুতি ফিরে এসো, ফিরে এসো চাকা।

কালের অমল সখা কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস কিংবা
পাড়াগাঁয়ের মাটি ঘর, উঠোন, কবি বন্ধু নিবিড় প্রকৃতি...
কাছে দূরে মানস ভ্রমণে যাত্রাপথে তুমি কবিতা পথিক।



কিছু অনটন কথা ■ দুর্গাদাস মিদ্যা

মগ্ন সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে
যাবতীয় মগ্নতা হারিয়ে ফেলেছি।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দুমুঠো রোদ্দুর।
সে্ও আজ মেলে না তেমন।



অগ্নিদগ্ধ হৃদয় এক গণ্ডুষ জল চায়,
ছায়ায় বসতে চায় মাঝে মাঝে এই ক্লান্ত শরীর।
বৈকল্যবোধ এত বাড়াবাড়ি করে মনে হয়
এই বুঝি শেষ পরিচয় জগতের সাথে।
কাঁধে হাত রেখে কেউ কি বলবে না কোনো দিন
আমি তোমার পাশে আছি এই সময়ে।

কী এমন চাওয়া বলো? তাও পাওয়া যাবে না।
ভাবতে কেমন লাগে।

মৃত্যু
সোমা বিশ্বাস

মেঘহীন আকাশ... স্বরহীন ভাষা
মানুষ কি করে মৃত্যুহীন বাঁচে
ঔজ্জ্বল্যহীন চন্দ্র... সৌরভহীন পুষ্প...
এ প্রশ্নের উত্তর পাবে অশ্বত্থামার কাছে।

ক্ষুদে কাব্য
মাসুদুর রশীদ

তোমাকে হারানো দুঃখ
ভুলিয়ে দেবে দাম।
অধরা তুমিতো চাল নও
মানুষ, খিদের গুদাম।

জীবনটা অসমাপ্ত কবিতা
মাহমুদুল হক সৈয়দ

মন্দবাসার সাথে জীবনভর লড়তে লড়তে
হৃদয় আর পিন্ডটাকে
যুতসই কোনো ভালোবাসাই দেয়া হয় নাই;
জীবনটা তাই অসমাপ্ত কবিতা।

ধান্দাবাজ
শ্যামসুন্দর বসু

কাজ থেকে কথা বেশী
তাকে দিয়ে কাজ নয়
ফাঁকি দেয় সব কাজে
বড় বড় কথা কয়।

একাকিত্ব
অরিত্র দাস

বহুত্বে ভরা ভারতীয় সমাজ
ভুগছে আজ একাকিত্বে
গেরুয়া সবুজ যা আছে সব
চোখ যে একক অমরত্বে।

লালসা
কার্তিক পাত্র

ছোট্ট ভ্রমর উড়ে বেড়ায়
মধু পাবার আশায়
আমরা মানুষ মধু খুঁজি
সেই ভ্রমরের বাসায়।

সময়
ডালিয়া মুখার্জি

কিছু দুপুর মায়ের মত ভালোবাসা খোঁজে
কিছু বিকেল আড়মোড়া ভাঙে ঘুমের ভাঁজে,
কিছু মুহূর্ত ছেলেবেলা চেয়ে মনকেমনিয়া
কিছু স্বপ্নেরা বালিশ আঁকড়ায় বিষণ্ণ সাঁঝে...।

দেওয়াল
সুমন সাহা

তোকে দেখে হারিয়েছি
এ মনের খেয়াল।
তাই তুই তুলে দিলি,
মনের মাঝে দেওয়াল।

আদরিণী
সম্প্রীতি নস্কর

সাদা রঙের খরগোস,
তুলতুলে গা
দুধভাত মাখা আছে
চেটেপুটে খা।

একদিন
বীনাপানি দাস

একদিনেই এসেছিলাম পৃথিবীর বুকে
একদিনেই চিনেছিলাম মাকে
আবার এক দিনেই সব মায়া ত্যাগ করে
যাবো আপনজনকে ফেলে ফাঁকে।

মা
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সৃষ্টির টানে প্রথম ধ্বনিত
সেই যে শব্দ মা।
বর্ণে, ছন্দে-ভাব অলঙ্কারে
আজকের কবিতা।

রাবিন্দ্রিক
অমিত পাটোয়ারী

আকাশ খুঁড়ে খনিজ নিলাম, রাবিন্দ্রিক
সমস্ত রাত জমবে ভালো মহফিল্
সোনার তরী হৃদয়টুকু নিংড়ে নিক—
কয়েকশো গান ডানায় মাখে গাঙচিল।

বিভেদ
মনোজকুমার রায়

দেখার আগেই চোখ বুজে যাওয়ার কথা
সন্দেহ বাড়তে থাকে ক্রমশ
বিভেদ ঘটে দুই মেরুতে!

আমরা
জীবেশ ব্যানার্জি

জলের মধ্যে স্বচ্ছতা
মনের মধ্যে তিক্ততা
অন্দরে খেলা করে শিশুরা
মুখোশে খুব ভালো আমরা।

রক্তলেখা
ইমানুর আলি

শুভ্র পাথরপৃষ্ঠে রক্তাক্ষরে
লিখেছি তোমার নাম।
শত জলোচ্ছ্বাসেও মুছবে না এ রক্তলেখা।
দিতে কি পারবে তুমি এ রক্তলেখার দাম?

মানুষ রূপী দেবতা
তপন জানা

ভিক্ষার ঝুলি হাতে
ভিখারিকে নয় তুই
তাড়িয়েছিস আসল দেবতারে
তোর আত্ম অহঙ্কারে।

মানানো

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

জীবন-পথে হোঁচট খেয়ে তোমায় দেখা,
ব্যথা পেলেও অনেক কিছু হ'ল শেখা;
মিষ্টি হাসি, নীরবতাই অনেক জানায়,
এসব শুধু তোমায় মানায়, তোমায় মানায়।

স্বস্তি

ওয়াসিম আনসারী

অবশেষে তুমি এলে স্বস্তি এলো
বুঝতে না পারা
কথাগুলো আরো একবার
আমাকে ভিজিয়ে দিল।

মেল বডি

পঞ্চমী গোল

ছুটে চলি রোজ আমি যেন এক চলন্ত ট্রেন
স্টেশনে স্টেশনে তারা সব ওঠে আর নামে
জীবনের হাটে হল বিনিময় হল লেনদেন
সে চিঠি হায় এখনো আসেনি নীল রং খামে।

পরিহাস

জয়ীতা চ্যাটার্জি

গরীবের বুক জুড়ে শূন্যতা,
মাখা প্রেম প্রেম রোগ।
ভাগ্য পরিহাস করে রেখে গেছে,
বড়লোকের জন্যে কেবল সম্ভোগ।

চুপকথা

সুদীপ তন্তুবায়/নীল

মেঘ গুড়গুড় গণতন্ত্র, মেট্রো চুমু ছোঁয়া,
প্রতিবাদের ন্যাংটো দেহ, জয়নগরের মোয়া।

ভালোবাসা

কুমারেশ সরদার

ভালোবাসা হাসে ভালোবাসা কাঁদে
ভালোবাসা জল চোখে অবিরত,
ঢেউ ভাঙে ঢেউয়ে গড়ে
নদীবুকে আছড়ায় অবনত।

প্রভুত্ববাদ

অঞ্জনা দাস

তোমার প্রভুত্বে আমরা ঋণী সকলেরই মাথা উঁচু,
গণতন্ত্রে প্রভুত্ববাদ লজ্জায় মাথা নীচু।
গণতন্ত্রে প্রভুত্ববাদ রাজ্যে এ কোন ঢেউ
মুখ লুকিয়েছে গণতন্ত্র সে কথা জানো কি কেউ?

ভাদু উৎসবের গান

নিজামুদ্দিন মণ্ডল

এতটুকু ভাদু তোমার
ক্যামন করে লাচবে গো
ভাদু আমার ভাদু মণি
যেমন করে লাচে গো।

আজকাল
অন্বেষা হাঁসদা

নৈরাজ্যের ভিড়ে পদপিষ্ট হয় প্রতিশ্রুতি।
শিল্পের নগ্নতাকে দেখানো হয় বৃদ্ধাঙ্গুলি
মোমোর আতঙ্কে ভীত —খেলনাবাটি মন।
কবিতা ছুঁয়ে শুরু হয় সবুজ দিন-যাপন।।

মা
বিবেকানন্দ দাস

মায়ের ছিল পরিপাটি বেশ
শুভ্র শরীরে শুভ্র কেশ
কুসুম লতায় জড়ানো হৃদয়
পাখপাখালি হত না নিদয়।

দ্বিমুখী ভাবনা
স্বপ্ননীল

গভীর চুম্বনের দাগে ভিজে গেছে রাত
ইথারের নরম আলোয় লেগে আছে শেষ বীর্যপতন।
চিত্রগুপ্ত লিখে যাচ্ছে—
'সময় এগিয়ে যাচ্ছে দ্বাবিংশ শতাব্দীর দিকে!'

মনের পরিতোষ
নির্মাল্য মণ্ডল

কথার আনন্দ বলতে
শোনার আনন্দ জানতে
লেখার আনন্দ ভাবতে
জীবন আনন্দ হাসতে।

বিজয় রথ
দেবাশীষ অধিকারী

ভাবনার নীলাকাশে বিষণ্ণতার কুঠারাঘাত
ক্ষত-বিক্ষত হয় শরীর তবুও মন করে না কর্ণপাত
সময়ের অঙ্গুলি হেলনে চলে সে আপন পথ;
দৃঢ় প্রত্যয়ী মন, চড়বে সে বিজয়-রথ।

বাঁকা পথে
লক্ষ্মীকান্ত সিং

বিবেক যদি ভেবে
সোজা পথে হাঁটে
সত্যকে তাহলে
যেতে হয় না কোর্টে।

সুদূর
শ্যামসুন্দর গুঁই

তুমি ও কি চন্দ্রাভিমুখী
তারাদের সাথেই প্রহর গোনো
সপ্তর্ষিমণ্ডলে বাঁকা তলোয়ার
সুদূর সে স্বপ্নই শুধু জেনো

প্রেমের কুঞ্জবনে
দুলাল সুর

প্রেমের কুঞ্জবনে ফুটেছিল ফুল
ফাগুনের আগুন ঝরা কুহুতানে
অনাদরে অবহেলায় হয়ে গেছে ভুল
ভালোবেসে প্রিয়া তুমি চাহিলে না মুখপানে।

অভিমান
উৎপল ঘোষ

কথার ভেতরেও রয়ে যায় কথা
যেমন কাঠ পোড়ালেই অঙ্গার,
তেমনই নিজেকে পুড়িয়েছি বারবার

লীজ
চৈতন্য দাশ

মাটি যদি মুখ না খোলে
রাখব কোথায় বীজ?
পরে জানলাম পরপুরুষে
নিয়েছে ওর লীজ।

সংজ্ঞা
কিশলয় গুপ্ত

মানুষের সংজ্ঞা খুঁজতে এসে দেখি—
সবাই অনুবাদ হয়ে ধরা দিচ্ছে।

নৌকা
প্রদীপ মণ্ডল

নৌকা ভেসে চলে স্রোতের টানে,
বলিষ্ঠ বৈঠা পৌঁছায় গন্তব্য পানে।
পাল ছেড়ে যদি যাই সাগর দর্শন
অস্তিত্বের বিলীনতা অবশ্যই দেখে বর্ষণ।

সত্য অথবা মিথ
বিদ্যুৎ দেব

ঈশ্বর চিন্তা আমাদের সহিষ্ণু করে,
আইন-আদালত পুলিশের কাজ কী?
বন্যা ভাসিয়ে নেয় শহর নগর সহ মা-মাটি।
বাড়ে মানুষের যন্ত্রণা আর চুপ থাকে ঈশ্বর।

চলে যাবো একা
অভিষেক ঘোষ

চলে যাবো একা
রেখে আমার কবিতা,
অস্ত যাওয়া যেমন রবি
যায় রেখে গোধূলির উষ্ণতা।

হয়তো
সপ্তর্ষি

আবেগগুলো আজ মৃত, জীবনটা যান্ত্রিক
তারা তো আর পেট ভরায় না,
কিন্তু যন্ত্রও এক সময় বিকল হয়
তখন আবেগগুলোই জীবিত রাখে, হয়তো....

ব্রহ্ম পায়েস
অসীম দাস

পাখির মতো গাইতে পারো গান
কিংবা মুগ্ধ নদীর কলতান?
পাততে পারো বক্ষে শীতলপাটি
ব্রহ্ম-পায়েস সুজাতা - হাত বাটি?

জাহান
সত্যজিৎ রজক

ওসব ধুঁয়ো মেশানো বাতাসের শব্দে কান রেখোনা জাহান
তোমার হাত ধরেছি আমি, আছি পাশাপাশি
আরেকটু পাশে এসো, জড়িয়ে ধরো
দেখবে হৃদয় মিলনেই আছে জুম্মা কাশী।

গান্ধারী
তরুণার্ক লাহা

গান্ধারী আজও কাঁদে
খোলা তার দুই চোখ
সত্যের জয় চায়
যাই হোক পুত্র শোক।

দেখো
মিলন তরফদার

চিতার আলোকে ঝলমলে দশদিক
পারলে বরং নিজস্বী তুলে রাখো,
প্রতি-নিঃশ্বাসে ব্যস্ততা মৌখিক...
ফুরসতে নয় গ্যালারি হাতড়ে দেখো।

শীতের বেলা
কল্যাণী মণ্ডল

পাতা ঝরা কুয়াশার রাত
নির্জনে ভেজে একা ঘাস
খেজুর গাছ রসে টইটুম্বুর
শিউলী জবা ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

অতিথি
রূপক গুহ

দুটো সময়, সকাল আর রাত
একটা দিন, ২৪ ঘণ্টা
নিমন্ত্রণ কিম্বা আমন্ত্রণ
আজ নয় কাল, অতিথি আসবেই।

দিন কেটে যায়
শুভঙ্কর

মিটমিটে দিন সময় সঙ্গীহীন
দাঁড়িয়ে আছি ফর্মাল ড্রেসে
দিন কেটে যায় সিগনালে রাস্তায়
সস্তায় টেনশান বিকোয় অফিসে।

সামাজিক
শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

'যা হবার তা হবে' এইভাবে ভেবো না
তার চেয়ে এসো সব, মিলেমিশে করি কাজ
সামাজিক আধিব্যাধি, জঞ্জাল সাফ করি
সমাজে তো বাস করি, দায়ভার নেবে না?

কাঙ্খিত পরাজয়
অরণ্যজাতা মুখোপাধ্যায়

নৌকা ঘাটে বাঁধতে গিয়ে দেখি,
তীক্ষ্ণ আরও তীক্ষ্ণ হল ক্ষত;
কনেচন্দনে লজ্জারাঙা মুখের
ওর হাসিটাও ঠিক তোমারই মত।

স্রোত

সুপ্রিয়া চক্রবর্তী

জীবনস্রোতে জীবন যেমন বয়
নদীর স্রোতের মতোই বয়ে যায়
কখন আসে জোয়ার কখন ভাঁটা
কখন ফুল কখন ফোটে কাঁটা।

হৃদয়ের মাদল

চিন্ময়ী মিত্র দাস চাকলাদার

আমার রাত্রিরা জেগে থাকে—
তোমার হৃদয়ের দরজায়;
প্রতি বসন্ত আসে
মাদলের দোলনায়।

অভিমানী

আনোয়ার আবদুল্লাহ

তোমার কারণে বাতাসেরা আজ অভিমানী
তোমার ঢেউ খেলানো সুগন্ধি চুলে;
আজ ওরা খেলা করতে গেছে ভুলে
ওরা আজ থমথমে, হারিয়েছে ধ্বনী।

শিল্পী

সুকুমার গরানী

স্বপ্ন গড়া স্বপ্ন ভাঙা
স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে
একদিন স্বপ্নদের কাঁধে চেপে
প্রিয়জনদের চোখে স্বপ্ন হয়ে যাওয়া।

নৈবেদ্য

আশিস ভৌমিক

গিয়েছি নদীর তীরে বারবার, অভিসারে
দেখেছি প্রতিচ্ছবি স্বচ্ছ সলিলে
তবু দিই না সাঁতার তাতে
পাছে তা হারায় ঘোলা জলে।

মনের মধ্যে

কিশোর কুমার দলুই

মনের মধ্যে বনের পশু,
বর্বর মন উর্বর চেতনা
লড়াই-লড়াই-লড়াই এ
দমন করতে পারলেই তুমি মানুষ।

নিয়তি

মেহেবুব আলম

ওহে পথিক....ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও, মোর কবরের পাশে।
খোদাকে বলিয়া যাও, ক্ষমা করো লাশে।
দু-চারটি আয়াত পড়ে দিও উপহার,
এই তো নিয়তি মোর কদমে তোমার।

পুরুষ ও নারী

ফিরোজ আলি আবির

পুরুষ তুমি পাথর হয়ো
নারী তুমি জল
ভালোবাসার মিলন ঘাটে
ঢেউ হোক সম্বল।

তুমি আমি বা সে
তাপসী লাহা

আসলে কারো নয়,
চিন্তাসূত্রের সুতোটা পাক খেয়ে গুটোয়
তুমি আমি বা সে বসে থাকে ধন্দে দ্বন্দ্বে
ভুলগুলো খেয়ো গুলে জলে।

ভারতভূমি
উদয়কুমার সাহা

নূতন রূপে রসে ভরবে ভারত ভূমি
নূতন সূর্য উঠবে আবার
সূচনা হবে নূতন দিনের
হিংসা লোভ লালসা সরিয়ে দূরে।

মধ্য-আকর্ষণ
প্রত্যুষা সরকার

বাঁকের ওপর ঠোঁট বসেছে, ঘা হয়েছে খুব
ঘুমের ঘোরে শরীর দিল আগুলহাসে ডুব।
উত্তমাশার ঝোড়ো স্রাবে সাঁতরে চলে
প্রেমিকরাত ফুরালে হৃদপিণ্ড আদতে ফিলোফোবিক।
('আগুলহাস' —উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে একটি উষ্ণস্রোতের নাম।)

মাথা
নরেশ জৈন

তুলছি মাথা
কাটছে মাথা
যুগ যুগ ধরে
সত্যি কথা।

মাত্র চার লাইন?
অশোককুমার পুরকাইত

কি লিখবো, ভাবতে ভাবতে রাত্রি প্রায় শেষ।
অণুকবিতা! ছন্দোময় কাব্য, নাকি অন্তমিল?
ভাবছি আর আনমনে লিখেই চলেছি বেশ।
শেষে দেখি কয়েকটা মাত্র শব্দ, ছন্দ গরমিল।

হারায়নি তো কিছু
কাকলি চট্টোপাধ্যায়

ঘোর লেগেছে বিষম জোরে
'নেই' বলে কিছু আছে নাকি?
সবই আছে ধরার বুকে
কখনো পাবে কখনো ফাঁকি।

হয়ে ওঠেনি
রাধেমোহন

লৌকিকতার শাঁখা, সিঁদুর, হয়ে ওঠেনি কেনা...
তাই শত জীবন বিসর্জনেও শোধ হবে না দেনা!
উপঢৌকন...কলঙ্ক আর অপবাদের মালা....
কৈলাশ শৃঙ্গে উপভোগ্য... সতী দাহের জ্বালা!

অধরা
স্বর্ণকমল তপস্বী

নয়নে নয়নে নয়নচুরি
তবু হবু পরিণয়
ধরা পড়েও
রয় অধরা রয়।

বলে দিও
অভিষেক দাস

বৃষ্টিহারা আকাশ কেন কাঁদে
বকুল হারা গাছের কাছে জেনো
গন্ধ হারা ফুলের ক্রন্দন
পেখম হারা ময়ূর বলে দিও।

বিপন্ন অতীত
নন্দিতা মিত্র

তুমি দিয়েছিলে প্রেম
আমি ছিলাম তোমার প্রেয়সী
জরাগ্রস্ত স্মৃতির পাহাড় ভেঙে গেছে
তাই নির্জনে ঘুমোচ্ছে বিপন্ন অতীত।

জীবন
প্রদীপ সেনগুপ্ত

পদ্ম পাতায় জল
করছে টলমল—
জীবন যেন বলছে হেসে
আর কতক্ষণ বল?

বিষ
ভীম ঘোষ

শিক্ষা মানে, জ্ঞানের আলো
এ যে শিক্ষা, মনের কালো।
শিশু মনে ঢুকছে বিষ
সবাই বলছি, ইস্ ইস্ ইস্।

তোমায় নিয়ে
শাহীদ লোটাস

তোমায় নিয়ে
শূন্যে ভাসি
শূন্যে উড়ি
প্রজাপতির মত।

এখনও
অমরকুমার দাস

এখন আর মানুষ দেখি না
নদী নালা ধান সিঁড়ির দেশে
স্মরণীয় হতে
তবু ভালোবাসা এখনও সবুজে সবুজ।

মৃত্যুর উপত্যকা জুড়ে হাঁটছি আর হাঁটছি
দেবব্রত দে

মৃত্যুর উপত্যকা জুড়ে হাঁটছি আর হাঁটছি
এখানে মৃত্যুরা জীবনের গান গেয়ে যায়।
শব যাত্রার মিছিলে আপন' জনের মুখ,
বেঁচে আছি মৃত্যু' মিছিলে পা মেলাবো!

ঝড়
সন্ধ্যা সাহা

কচিপাতায় সবুজ বরণ
কালের তাপে হচ্ছে ধূসর
হার জিতের খেলার মাঠে
সরল মনে তুমুল যে ঝড়।

খুঁজে ফিরি
সুমিত বিশ্বাস

খুঁজি তোমায় আকাশ পাতাল
খুঁজি সুপারনোভার দেশে
আছ কি তুমি তারাদের সাথে মিশে।
তোমার প্রেমে আমি কাঙাল শেষে।

শীতের মজা
রেবা মুখার্জি

শীত এসে গেল, শীতের কি মজা!
তোমার আমার সবার গায়ে চাদর
পথের ধারে যে শিশুটি বসে
তার গায়ে জড়িয়ে আছে কাপড়।

ভীষ্মের ভিক্ষা
বিজয়কুমার মাল

আমার মনে হয় ভীষ্ম আজো তার
মাতৃভূমিকে ছাড়তে পারেনি, আজো তার দেহ
ছেড়ে যায়নি। শরশয্যায় আজো! তার
প্রতিজ্ঞা যৌবনের সমুদ্র উচ্ছ্বাসের মতো...

অস্থি বিশেষজ্ঞ
ডাঃ সমীরকুমার বেতাল

অস্থি বিশেষজ্ঞ হতে গেলে
অ্যানাটমি ভালো পড়া দরকার
অ্যানাটমি ভালো জ্ঞান না হলে
হাড়ভাঙা রুগী হবে জেরবার।

বিক্ষিপ্ত
নিক্কন

একশ একটা দিনের শেষে যদি বল ভালোবেসে,
ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে তোমার?
তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে
জীবন জুড়ে বিষাদের হাহাকার।

নীরব চাহনি
মায়ারানী সাহা

তোমার নীরব চাহনি মাঝে
বার বার আঁখি মেলে
হেরি যবে তাই কতদূর ধায়
কে কার হৃদয়ে বাঁধা।

অনবলুপ্তি
গোপালচন্দ্র হালদার

আজ স্মৃতির সেলফটার ধুলো ওড়াতে গিয়ে
বেরিয়ে এলো বিবর্ণ এক বিস্মৃতির ডাইরি।
তোমায় উৎসর্গ করব বলে লেখা কবিতাটাও মলিন।
তবে শুকনো গোলাপের সৌরভ আজও অম্লান।

আদরের বোন
সুদীপা সাহা

আমার দুষ্টু মিষ্টি
আদরের বোন ববিতা
সে দিন রাত
পড়ে শুধু কবিতা।

ধর্ষিতা
পিনাকী বসু

ছিন্নভিন্ন শরীরটাতে বিষাক্ত সব পোকা
চোখের সামনে ধূসর এখন কাঙ্খিত নগ্নতা
জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে নিদারুন এক ক্ষোভে
মৃত্যুসজ্জা সুসজ্জিত সহবাসের লোভে।

বয়স
তরুণকান্তি নাথ

সাদা ওড়নায়
জেগেছে ঝুমুর সকাল
হাঁটি হাঁটি পাপা
পিছনে স্মৃতির চাতাল।

আলোয় ফেরা
পাণ্ডু বিশ্বাস

অন্ধকারে প্রবল ঢেউয়ে টালমাটাল
তীব্র আলোয় চোখ খুলেছি — হাসপাতাল!

একলা দোলায় শুয়ে আছি — হে ঈশ্বর
আমার দেবী স্মীত হাসে অতঃপর....

কিছু প্রশ্ন
মণীষা দে

সব নদী কি মোহনা খুঁজে পায়?
সব পাখি কি সত্যি নীড়ে ফেরে?
যে হারায় সে কি চোরাবালিতেই হারায়?
নিরুদ্দেশী সবাই ফেরে কি ঘরে?

চিরশান্তির খোঁজে
বি. কে. স্বপন

অঙ্ক নয়, সময়কে সাক্ষী রেখে কথা হোক
ছাদে নয়, গাছতলায় বসে হোক আলাপচারিতা
সাময়িক নয়, চিরশান্তির খোঁজে
উঠে আসুক ভালোবাসার প্রসঙ্গ...

মনঘুড়ি ভোঁ কাট্টা
সুজান মিঠি

প্রশ্ন যখন মানবতার, বিবেক ঘুমিয়ে থাকে,
আলতো ছোঁয়ায় হিংসুটেরা, গন্ধ ছড়ায় পাঁকে।
সারাজীবন দ্বন্দ্ব দোলায়, মনঘুড়ি ভোঁ কাট্টা,
বিবেক হাসে ঠোঁটের কোণে, ভারী মজার ঠাট্টা।

বৃত্ত

চৌধুরী নাজির হোসেন

পেন্সিল হাতে আঁক কেটেছিলাম শূন্য খাতায়, সেটা কি, ঠিক জানিনি
তারপর বাড়তে বাড়তে, ভাঙতে ভাঙতে, হাতের মুঠোয় এক পৃথিবী।

আমার ঘর-সংসার

অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়

চার-দেওয়ালেই তোমরা বাঁধা, আমার ঘরতো হাজার হাজার
এমনই আমার ঘর-সংসার, কোনো দেওয়াল নেইকো যাহার।
তোমরা যদি বাঁচতে চাও—ঘরের থেকে বাইরে এসো,
নিজের সাথে বিশ্বটাকে, প্রাণের যোগে ভালোবেসো।

স্মৃতি

আনজারুল মোল্লা

হারিয়ে গেছে অনেক কিছু সকাল থেকে রাত,
হারিয়ে গেছে পাশাপাশি আঁকড়ে ধরা হাত।
হারিয়ে গেছে প্রথম প্রেমে টুকরো হওয়া মন,
চলতে চলতে হারিয়ে গেছে বন্ধু প্রিয়জন।

বাংলাদেশ

মোহাম্মদ বাদশাহ আলম

শত মন্দির, মসজিদ, গির্জার
অগভীর মিলন যেথা,
সহস্র ঝর্ণা ছুটে চলে, যেথা শান্তি মৈত্রীর প্রেমে
জীবনানন্দের এই জারুল, হিজলের বাংলাদেশ।



স্কেচ : রেবা মুখার্জি

প্রতিযোগিতার বাইরে

বোদ্ধা/অনুপকুমার আচার্য

—দারুণ! বাজনা শেষ হলে সঞ্চালিকার গলায় উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ল।

যন্ত্রশিল্পী ঈষৎ মাথা নুইয়ে বুকে হাত রাখলেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে।

টিভি চ্যানেলের গানবাজনার আসর। রোজ সকালের নির্ধারিত অনুষ্ঠান। এক ঘণ্টার মেয়াদী আসরে কণ্ঠসঙ্গীতেরই প্রাধান্য থাকে। আজ উদীয়মান শিল্পীর বাজনা শুনছেন ধর্মদাস।

তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের ভক্ত নন। আসলে তেমন কিছু বোঝেন না। রাগ-রাগিনী তো একেবারেই না।

তবু, রিটায়ারমেন্টের পর কিভাবে যেন অনুষ্ঠানটির নেশায় পড়ে গেছেন। ভালোই লাগে চেনা-অচেনা শিল্পীদের গলায় গান শুনতে। পুরনো দিনের গান। একালের গানও। কোনো কোনো কণ্ঠের গানে মুগ্ধ হন। চমকে ওঠেন। কঠোর অনুশীলনের ছোঁয়া টের পান।

অল্প বয়সে গান শেখার চেষ্টায় নেমেছিলেন। হরেক জাঁতাকলের চাপে এগোয়নি খুব কিছু। তবু, গানের তেষ্টাটা রয়েই গেছে।

নতুন রাগ বাজাবার জন্য শিল্পী তোড়জোড় করছিলেন। সঞ্চালিকার অনুরোধে সম্মতি দিয়ে ক্ষান্ত হলেন।

টেলিফোনে কোনো আগ্রহী বন্ধু বলার অপেক্ষায় আছেন। কণ্ঠসঙ্গীতের বেলায় এরকম অবস্থায় ধর্মদাস বিরক্ত হন। অমনোযোগী হয়ে পড়েন। তিনি চান যথাসময়ে গান শুনবেন।

এখন হলেন না। আগ্রহী দর্শক কী বলেন শোনার আকাঙ্ক্ষায় উৎকর্ণ হলেন।

বন্ধু নিজের ঠিকানার সঙ্গে আত্মপরিচয় দিলেন। সঞ্চালিকাকে সুপ্রভাত জানালেন। শিল্পীকে নমস্কার। সহযোগী শিল্পীদের অভিনন্দন। গলার স্বরটি ভরাট। বলার ভঙ্গি সুন্দর। ধর্মদাস অমনোযোগী হতে পারলেন না।

নিজেকে শিল্পীর গুণমুগ্ধ শ্রোতা দাবী করে বন্ধু বলতে শুরু করলেন শিল্পীর অনেক অনুষ্ঠান শোনার সুযোগে তিনি সৌভাগ্যবান। তাঁর বাজনার ভূয়সী প্রশংসা। টেলিফোনে বন্ধুর গলায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। ধর্মদাস আকৃষ্ট হলেন। রাগের নামোল্লেখ বিরক্তি নয়, বরং সমীহর জন্ম দিচ্ছিল ভেতরে। জমাট আক্ষেপটা মাথাচাড়া দিল নতুন করে। কিছুই হলো না জীবনে!

টেলিফোনে একজন সমঝদার বোদ্ধা মানুষকে টের পাওয়া যাচ্ছিল।

নিজের পছন্দের রাগ বাজাবার অনুরোধ জানিয়েও বন্ধু থামলেন না। কথা বলার ফাঁকে মিশিয়ে দিলেন ব্যক্তিগত পছন্দ, অভিজ্ঞতার কথা। জ্ঞানগম্যি উজাড় করে দিচ্ছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ করা ভঙ্গি থামানো মুশকিল।

শিল্পী, সঞ্চালিকা—দু'জনের শরীরী ভাষায় অস্থিরতা। অধৈর্য হয়ে পড়ছেন ধর্মদাসও।

—সুন্দর অনুষ্ঠান। শিল্পীর হাতে সেতার কথা বলছে আজ। আচমকা থেমে গেলেন দর্শক। সঞ্চালিকার কথায়।

মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় ঝাঁকুনি খেলেন ধর্মদাস। বন্ধু সেতারের কথা বললেন। শিল্পী বাজাচ্ছিলেন সরোদ!

প্রতিযোগিতার গল্প সম্ভার

শূন্যের বুকে/ প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মেয়েটির নাম শূন্যতা পানিগ্রাহী। সবাই শূন্য বলেই ডাকে। জন্মের পরে পরেই মাকে হারিয়ে সে দাদু-দিদার কাছেই মানুষ। তুলনামূলক বাংলা সাহিত্যে এম এ পাশ করেছে। সাথে দুটো বিদেশি ভাষা। জার্মানি এবং ফ্রেঞ্চ। ইচ্ছে ছিল সাংবাদিকতা করবে। বাইরে চলে যাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সেসব কিছুই হলো না। যে মামা ওকে ওর বাবার কাছে না দিয়ে, বাচ্চাকালে দত্তক নিতে চেয়েছিল, সেই মামাই বিয়ের পরে মামীর চাপেই হোক কিংবা কর্মব্যস্ততার কারণে ক্রমশ কেমন যেন পাল্টে যেতে লাগলো। পয়সা-কড়ি দিত ঠিকই, কিন্তু ঠিকমতো নজরদারি করতো না।

শূন্যতা বরাবরই একটু অন্য চরিত্রের। নিজেকে শেষ করে দেয়ার খেলা খেলতেই ভালোবাসে। ব্যাপারটা ওর মনের অগোচরেই দানা বাঁধা শুরু করেছিলো। এই সময়েই ওর সাথে সম্বিতার আলাপ। সম্বিতা মহিলা হলেও নিজেকে ছেলে বলে ভাবে। ভালো চাকরি করে। ঠিক করেছে বিয়ে-সাদি করবেই না। শূন্যতারও সেই চিন্তা-ভাবনা। দুজনে ঠিক করে ফেলে সারাটা জীবন ওরা একসঙ্গেই কাটাবে। শুরুও করেছিল থাকা। কিন্তু, কাল হলো দুজনের দুই ভিন্ন চিন্তা এবং সত্তার দ্বন্দ্ব।

শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ওরা। সম্বিতা নিজের বাড়িতে আর শূন্যতা ওর মেসে শূন্য বুকে বসে চোখের জলে বন্যা এঁকে চলেছে।

অপরাজিতা/ অমৃতা বিশ্বাস সরকার

গ্রামের তেমাথায় পাকুড়তলাটা পেরিয়ে কিছুটা এগোলেই একটা বড় মাঠের একপাশে কুমুদপুর গার্লস স্কুল। গ্রামের লোকেরা ওটাকে অবশ্য মাঠের স্কুল বলেই চেনে। মূল ফটকের কাছেই থাকা বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটার গোড়ার দিকের বাঁধানো জায়গাটায় বসে অম্বা, রানী, নূপুর আর অনিতা। ওদের আজ খুব মন খারাপ—আজ বাদে কাল সহপাঠিনী বকুলের বিয়ে যে। ওরা সকলেই এ বছর মাধ্যমিক দেবে। বকুলের হয়তো আর পড়াই হবে না। বিয়ের পর ও তো শহরে চলে যাবে। ওর হবু বর নাকি সেখানে এক পেট্রোল পাম্পে চাকরি করে। বরের বাবাও নাকি হেলথ্ বিভাগে চাকরি করতো। বড় দালান বাড়ি আছে। এমন সম্বন্ধ কেউ হাতছাড়া করে! বকুলের বাবা হারু চাষিও তাই রাজি হয়ে গেলো। তাছাড়া হারুর মায়ের কথা—"মেয়েছেলে, একদিন তো বিয়ে দিতেই হবে।

আজ না হোক কাল। যাচা ধন ছাড়িস নে রে হারু।" ষোলো ছুঁই ছুঁই বকুলের দুটো ডাগর ডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কিন্তু করেও বকুলের মা শেষমেষ কর্তাকে বলেছিলো— "অন্ততপক্ষে মাধ্যমিকটা পেরোলে হতো না? মেয়েটার বয়সটাও একটু পাকা হতো।" তাই শুনে হারুর মাথায় আগুন চেপে গেলো, বললো—"তোমার কি মতিগতি বলো তো? মেয়েকে কি গলগ্রহ করে ঘরে বসিয়ে রাখতে চাও?"

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন চলে এলো। কনে সাজে বকুলকে কেমন যেন বড় বড় লাগছিলো। বিয়ের কাজ যথারীতি এগিয়ে চললো, কিন্তু গোল বাধলো কনেকে আনতে গিয়ে। কনে নেই, কোথায় গেলো খোঁজ, খোঁজ। শেষে লগ্ন পেরিয়ে গেলো—বরযাত্রী সহ বর ফিরে গেলো খালি হাতে। কেউ কিছুই ঠাওর করতে পারলো না।

রাত পোহালো, সকাল হলো। দিনের আলো ফোটার সাথে সাথেই বকুলের অন্তর্ধান রহস্যও খোলসা হলো। মেয়ের বিয়ে মনে মনে না মেনে নিতে পেরে বকুলের মা-ই ওকে গোপনে নিজের সইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। বকুলের সাথে ততক্ষণে দরজায় দাঁড়িয়ে পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা। গ্রামের কিছু মুরুব্বি গোছের লোকও আছে। এতদিনের সবকিছু মেনে নেওয়া নিজের বৌয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে হারু একেবারে হতভম্ব। ততক্ষণে বাসি ছাঁদনাতলা পরিষ্কারের কাজ প্রায় শেষ। হঠাৎই হারুরও মনে পড়ে গেল বৌয়ের বাপের দেওয়া নামটা—'অপরাজিতা'।

পকেটমার/সুভাষ ভদ্র

চা বাগানের পর চা বাগান। তার দুধারে উঁচু নিচু জমির ধার ধরে গড়ে উঠেছে সাঁওতালি গ্রাম। গ্রাম বলতে হাতেগোনা কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। সকলেই চা বাগানের শ্রমিক।

তেমনি এক শ্রমিক শুক্রু ওঁরাও আর তার স্ত্রী মংলী। এক সকালে তাদের ঘর আলো করে জন্ম নিল এক ছেলে বিহান। সকালে জন্ম হয়েছে বলে নাম তার বিহান। চা বাগানের কাজ করে যা পায় তা দিয়ে তাদের চলে যায়। ধীরে ধীরে বিহান বড় হয়। আর চারিদিকে চা বাগানগুলো একটার পর একটা বন্ধ হতে থাকে। কাছের বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুক্রু দূরে যায় রোজগারের আশায়। ঘরে যে খাবার ছিল তা দিয়ে মা আর ছেলের দুদিন চলে যায়। তারপর ঘরে আর দানা নেই। মংলী ভাবে বিহানের মুখে কি তুলে দেবে। এভাবে দিনের পর দিন যায় বিহানের বাপ আর ঘরে ফেরে না। ছেলে মায়ের কাছে খাবার চায়। দে না মা ভাত, বড় খিদে পেয়েছে। একটু ভাত দে।

মংলী বাগানের চারপাশ ঘুরে বেড়ায় চা ফুল তুলবে বলে। বাগানের ম্যানেজার চিৎকার করে বলে চা বাগান বন্ধ তুই জানিস না, এখানে কি করছিস? ম্যানেজারকে দেখে মংলী তার কাছে ছুটে যায়। তার পায়ে ধরে বলে, বাবু দুটো ভাত দে ছেলেটাকে খাওয়াব। ঘরে একটা দানা নাই। মোর মরদ ঘরে ফেরে নাই তিন দিন হল। তার কোনো খবর নাই।

ম্যানেজার মংলীকে কাজের খোঁজ দেবে বলে সাথে করে নিয়ে যায়। ম্যানেজার খাবার কিনে মংলী আর বিহানকে খেতে দেয়। মংলী ছেলেকে ম্যানেজারের কাছে রেখে পাড়ি দেয় শহরে। এবার ছেলেকে পেট ভরে খাওয়াতে পারবে বলে মংলীর চোখ চকচক করে ওটে। এ শহর থেকে অন্য শহর তারপর আরো অন্য শহর। মংলী হারিয়ে যায় শহরের অলিতে গলিতে। পরিচয় হয় আরো অনেক মংলীর সাথে। তার আর বিহানের জন্য খাবার নিয়ে ফেরা হল না।

বিহান এখন বড়। ভুলে গিয়েছে বাপের চেহারা, মায়ের মুখ। সে এখন বিহান পকেটমার।

কবিমানস/রাশেদ মোশাররফ

স্কুলের প্রথম শ্রেণির ক্লাস টিচার মোহনা শাহেদ ইংরেজি ক্লাসে ঢুকলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল। মেম হাসিমুখে 'গুড মর্নিং, স্টুডেন্টস' বলতেই সবাই সাথে সাথে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, 'গুড মর্নিং টিচার'। মেম 'সিট ডাউন অল'—বলামাত্র সবাই নিজ নিজ সিটে বসে পড়ল। নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, বাবা কি করেন?—এমন চারটি প্রশ্ন তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখে ছেলেমেয়েদেরকে তা জমা দিতে বললেন। মেমের কথামতো সবাই উত্তর লিখে খাতা জমা দিল। মেম সবগুলো খাতা পরীক্ষা করছেন, একটি খাতার উত্তরে তার কৌতুহলের উদ্রেক হল।

—ফাইজা, স্ট্যান্ড আপ। বাবা কি করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি লিখেছ, কবিতা লেখেন। তোমার বাবা চাকুরি, ব্যবসা বা অন্য কিছু করেন কি না?

—ইয়েস, মেম। রুটিন অনুযায়ী সকাল হতে দুপুর যে কোনো সময় তিনি কলেজে যান। কলেজে পড়িয়ে আবার ফিরে আসেন। বাসায় এসে আবার কবিতা লিখতে বসেন। দিনের বেশি সময় আমি, আরিশা, বাবা একসাথে থাকি।

—আরিশা কে?

—আমার ছোট বোন।

—তুমিই তো ছোট, শিশুমাত্র।

—মেম, আমি বড় হয়ে গেছি। আরিশাকে এখন কোলে নিতে পারি।

—তাই নাকি। আশ্চর্য ব্যাপার। তাহলে সত্যিই তুমি আরিশার বড় বোন হয়ে উঠেছ।

—মা ও ভাই তাই বলেন। প্রায়ই আমরা বাবার সাথে বাইরে ঘুরতে যাই।

—আচ্ছা, তোমার মা কি করেন?

— সকালে আমাদের সাথে নাস্তা করার পর বাসা থেকে বের হন। অফিসে যান।

—মা বাসায় ফিরলে তোমরা কি কর?

—সন্ধ্যায় মা বাসায় আসলে সবাইকে বাবা তার কবিতা পড়ে শোনান। কখনো আব্বু-আম্মু ডুয়েট আবৃত্তি করেন। আমরা খুব মজা পাই।

—ঠিক আছে। বসে পড়।

ফাইজা নিশ্চুপ বসে দেখে, মেমের হাসিমুখ মলিন হয়ে গেছে।

একমনে বাকি খাতাগুলোর উত্তর দেখছেন মেম, তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। চশমা খুলে টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে নেন। ভাবতে থাকেন, তারাও স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পেশাজীবী। মাত্র দশ বছর হল বিয়ে হয়েছে। শুধুমাত্র রাতের খাবার একত্রে বসে খেতে পারেন। কিন্তু তারপর বাচ্চার বাবাকে আর খুঁজে পায় না। তার ক্লান্ত শরীর বিছানায় নুয়ে পড়ে। ততক্ষণ নাক ডাকার ঘরঘর শব্দ আবেগ আর কামনার আগুনে জল ঢেলে দেয়। সকালে ঘুম থেকে জেগে দে ছুট। নাস্তা বাইরে সারেন।

আজকের মতো ক্লাস শেষ। থ্যাংক ইউ, অল। গুড বাই।

থ্যাংক ইউ, টিচার।

ওয়েলকাম।

নিষ্পাপ/ পাপিয়া মণ্ডল

ছোট্ট মেয়ে দিঠি। কতই বা বয়স, ওই চার কি পাঁচ। খুব মিষ্টি মেয়ে। নিজের ওজনের প্রায় দ্বিগুণ ওজনের একটা ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যায়। অটোতে যায় আর সারাটা রাস্তা বকবক করে। মাঝে মাঝে অটো কাকু ধমক দিয়ে থামান।

আজ দিঠির স্কুল ছিল না। সকালবেলা মায়ের কাছে পড়তে বসল। বাবা অফিসের কাজে বাইরে গেছেন—আজ বিকেলে ফিরবেন।

পড়তে বসেই যত রাজ্যের কথা মনে পড়ে ওর...জানো মা, ঈশানীর পেন্সিল বক্সটাতে লাইট জ্বলে। জানো মা, পারমিতা আন্টির পেনটা খুব সুন্দর।

মা জোরে ধমক দেন...থাম এবার, বল—৬, ৭এ কত হয়?

ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ভুলভাল বলতে থাকে দিঠি।

মা ভীষণ রেগে যান,...'সারাদিন খালি বক্‌বক্। পড়াশোনা মনে থাকবে কি করে? সারা দুনিয়ার খবর না জানলে তো চলে না তোমার। যাও, আর পড়তে হবে না।' রাগ করে উঠে চলে যান মা।

মুখ ভার করে, বারান্দায় এসে বসে দিঠি। কিছু ভালো লাগছিল না তার। মেঝেয় ছড়ানো পুতুলগুলি ও নিল না...বাড়ির মিনি বেড়ালটা কাছ ঘেঁষে ঘুরলো, ওর সাথেও কথা বলল না। দুধকাকু, সবজিকাকু, মাছের মাসি সব্বাই পেরিয়ে গেল রাস্তা দিয়ে...কাউকে আজ কোনো কথা বলল না সে। খুব রাগ হয়েছে তার, কি এমন করেছে সে? শুধু তো একটু কথাই বলে সবার সাথে, তাই জন্য...অটোকাকু, আন্টি, মা ...কেন এত্তো বকে?

খুব মন খারাপ করছিল বাবার জন্য। একমাত্র বাবাই শোনেন ওর সব কথা।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে, কোল বালিশটা চেপে ধরে, মুখে বুড়ো আঙুলটা পুরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল, দেখল বাবা পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। চোখ কচলে, ধড়ফড় করে উঠে দুহাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে...জানো বাবা, আজ আমি একটুও কথা বলিনি কারোর সাথে। আজ থেকে আমি চুপচাপ হয়ে গেছি।

বাবা মুচকি হেসে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমার সোনা মা-টা...কথা না বললে, না হাসলে, দুষ্টুমি না করলে, একটুও ভালো লাগে না যে।

বাবাকে জাপটে ধরে, সে বকবক শুরু করে দিল।

দরজার বাইরে, মা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন বাবা-মেয়ের কাণ্ড। বাবার সাথে চোখাচোখি হতেই মুচকি হেসে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

বিহগ-জীবন/ রাজু কর্মকার

নীলাভ গগন-বক্ষে স্বাধীনচেতায় ভাসতে ভাসতে সীমান্তে গুলির আওয়াজ পায় ওরা—অভিন্ন হৃদয় পক্ষীযুগল—বিহগ-বিহগী। আবার শুরু হয়েছে মাটির লড়াই, স্বাজাত্যবোধের লড়াই। বিহগের হতাশায় সায় বিহগীর—"এরাই আবার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তার চেয়ে আমরাই আছি ভালো।" সত্যিই তাই। হয়তো বাসা ছোট, কিন্তু ভালোবাসা গহিন। মানুষের মতো জাত-ধর্মের হিংসা-মারামারি নেই, সম্পত্তির খুন-জখম নেই, লালসার ধর্ষণ নেই। নেই আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসর্বস্বতা। শুধু শান্তি-সুখ-স্বাধীনতা। ভাবতে ভাবতে অনেকটা উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বিশ্রাম নেয় তারা। মানবিক জীবনের টানাপোড়েনের মাঝে তারা তাদের স্বাধীন সুখের কথা ফুটিয়ে তোলে খুনসুটির মাধ্যমে।

হঠাৎ নিচের গগনভেদী আত্মচিৎকারে কেঁপে ওঠে তাদের ছোট দুটি বুক। কচি কোমল ফুলে শয়তানী ছোবল। এক অমোঘ লীলা খেলে যায় তাদের শরীরে-মস্তিষ্কে। সময় নষ্ট না করে নিমেষের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। কামান্ধ মানুষরূপী জন্তুটিকে ঠোকরাতে থাকে মুহুর্মুহু। প্রতি আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট শয়তানটি। এর মধ্যে নিজেকে কোনো উপায়ে মুক্ত করে একরত্তি মেয়েটি। কিন্তু তার পরিত্রাতাকে বিপদে ফেলে পালাতে রাজী নয় সে। তাই কিছুটা দূর এগিয়ে আবারও ফিরে আসে মানবিকতার ধ্বজা উড়িয়ে। বোঝানোর ভাষা না পেয়ে বিহগ তেড়ে যায় মেয়েটির দিকে—যা ভাগ। তা না হলে শয়তানটি আবারও তোকে...ঠোঁটের আক্রমণে এটাই যেন বোঝাতে চায় সে। অনন্যোপায় মেয়েটি চোখের জলে বিদায় নেয়। ওদিকে জন্তুটির জল্লাদী হস্তে রক্তাক্ত হয় বিহগী, কিন্তু সে অবস্থাতেও সঙ্গীকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর সে—"পালিয়ে যা বিহগ। তোকেও ছাড়বে না। এরা মানুষ। এরা এরকমই।" বিহগ কিছুতেই সঙ্গিনীকে ছেড়ে স্থান ত্যাগ করবে না। সেও প্রতি আক্রমণ শুরু করে। অবশেষে রণে ভঙ্গ দেয় সে। ততক্ষণে

সব শেষ। ডানা ঝাপটিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করে বিহগী। কিন্তু তার আগেই রক্তাক্ত ছোট্ট দেহ থেকে প্রাণবায়ু বাতাসে মিলিয়ে যায়। হতভাগ্য বিহগ তার প্রেয়সীকে আদরে ভরায়। ঠিক তখুনি নিঠুর জল্লাদের শক্ত কাঠ দুবার তার ঠিক মাথায় পড়ে। নিমেষের মধ্যে হরিহর আত্মা দুটির পুনর্মিলন হয় মানুষ নামক জীবেদের প্রতি ঘৃণা ছিটিয়ে—"ওরা মানুষ। ওরা সব পারে।"

ফেয়ারওয়েল/আশীষ ঘোষ

ফেয়ারওয়েলে পাওয়া উপহার আর ফুলের তোড়া টেবিলের ওপর পড়ে আছে, রজনীগন্ধার গন্ধ ভাসছে ঘরময়। চোখে ঘুম নেই, রাত শেষ হয়ে আসছে। গত সন্ধ্যায় ড্রইংরুমে আলোচ্য বিষয়—রিটায়ারমেন্টের পর এবার আমি কি করি। দুই ভাইয়ের মতে আমি আমার ইচ্ছেমতো বাঁচি, কিন্তু ভাইবউদের মতে আমি এখনো খাটতে পারি তাই একটা প্রাইভেট ফার্মে অনায়াসে জয়েন করতে পারি বা পাঁচটা টিউশন পড়াতে পারি। যে ভাইদের বুকে আগলে বড় করেছি, সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি, নিজের জন্য কিছুই রাখিনি তারা চুপ করে থাকলো। বুকের গভীরে জেগে ওঠা ব্যথা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে শিরা-উপশিরায়...আমাকে ঘিরে করতালি বাজছে আজ যে আমার ফেয়ারওয়েল।

বানভাসি, ওরে বানভাসি/শর্মিষ্ঠা ভৌমিক

বানভাসি মানে শুধুই কি বন্যার ভয়াবহ স্রোতে ভেসে যাওয়া। নাকি জীবন নদীর চরম চোরাবালিতে সিঁধিয়ে যাওয়া মানুষও কি বানবাসি নয়!

সেই ছোট বয়সে পদ্মার পাড় ভাঙা; জল যেন রাক্ষসের মতো দাপিয়ে, ঝাঁপিয়ে, সব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল। ভেসে যাই খড়কুটোর মতো। সবে আবার জমিজিরেতে লাঙল চালিয়ে বাপ আমার দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছে, পদ্মা আবার সর্বগ্রাসী হয়ে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দিল।

পাঁচটি ভাইবোনের পেটের রাক্ষুসে খিদে, বাপ-মায়ের অসহায়তা, মাথার ওপর বিদ্রূপ ভঙ্গিতে খোলা আকাশের চাউনি। 'বানভাসি' কথাটা তীরের মতো হৃদপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কালো রক্তের ঢেলা বানিয়ে দিয়ে অট্টহাস্যে মেতে উঠত। ভাবলাম এই শব্দটাকে জীবনের অভিধান থেকে ছুঁড়ে ফেলব।

আমার কঠিন মনোবলের কাছে জীবনপ্রকৃতিও মাথা নত করতে শুরু করল। বাবা ধারবাকিতে জুতো সেলাই করার সরঞ্জাম জোগাড় করে কালীঘাটের মন্দিরের কাছে তাঁর কাজ শুরু করলেন। আমি কাছের একটা বাড়িতে ঠিকে কাজ শুরু করলাম। একটু পরিস্থিতি মনে হল সহায় হচ্ছে, কিন্তু মাকে কখন যে এক মারাত্মক যক্ষ্মা রোগ ধরেছিল। হারালাম মাকেও। সব দায়িত্ব পড়ল একটি তেরো বছরের কিশোরীর ওপর।

আস্তে আস্তে ভাইবোনগুলোকে বিনে পয়সার স্কুলে ভর্তি করালাম। বাবারও দুটি রোজগার হতে শুরু করেছে।

পনেরো বছর অতিক্রান্ত। ভাই দুটি বাবার সেই মুচির কাজটিকে একটু উন্নত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, একটু ব্যবসার পদমর্যাদা দিয়েছে। উপহার পেয়েছে জীবন নদীতে সারা জীবন সাঁতরে। বাবার জীবনদীপও নিভে গেল। ত্রিশ বছর চোখের পলকে পার।

সবাই প্রতিষ্ঠিত। বিলাস, ব্যসন, অর্থ। সুন্দর তিনটি জামাই, দুটি মা লক্ষ্মী বৌমা। আর কি চাই। এখন আমি কখনও শিশু, কখনোও কিশোরী, আবার তরুণীও হয়ে যাই। তবে মনে মনে। মন যেন খুশির পালে হাওয়া দিয়ে ভেসেই চলেছে। কিন্তু বানভাসি হওয়া তো আমার জন্মগত অধিকার।

ক্ষয়রোগের কারণে হাসপাতালের বিনিপয়সার বেডে আমার আস্তানা। রোগমুক্তি ঘটেছে। ছুটি হাসপাতাল থেকে। কিন্তু কেউ আর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেনি।

এখন যে ভাইদের কাছে আমি সামান্য এক বানবাসি।

তুমি আমাকে আর খোঁজনি/ রাজর্ষি মজুমদার

সেদিনও সকালটা ছিল, অন্যান্য আর পাঁচটা দিনের মতো। ঘুম ভেঙে উঠে হঠাৎই পুরানো খবরের কাগজের ডাঁই ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেদিনের সেই পুরানো খবর, যাতে টাইপের অক্ষরে লেখা বীভৎস দুর্ঘটনা। (২নং জাতীয় সড়কে) বাসের ধাক্কায় মৃত এক, আহত এক।

আজ কদিন হল হাসপাতাল থেকে আমাকে ছুটি দিয়েছে। সেদিন থেকেই তোমাকে খুঁজছি, চোখ বন্ধ করলেই মনে পড়ে যায়, পুরনো কিছু স্মৃতি—কলেজ ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প, শুধু কি তাই; কত গানের লড়াই, তুমি ঠিক আমার বিপরীত দলে যোগ দিতে; শুধুই আমাকে হারাতে। আমিও তোমার কাছে ইচ্ছা করেই হেরে যেতাম তোমার মুখের ওই হাসি দেখতে। তোমাকে যে বড্ড ভালোবাসতাম।

তুমিও তাই, এক মুহূর্ত আমাকে না দেখলে তোমার মুখের ও হাসি ক্ষণিকেই বিষাদমাখা হয়ে উঠতো। সেলফোনে কলের পর কলে আমাকে খুঁজতে, বলতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

আমি তোমাকে রাগানোর জন্য বলতাম, যেদিন আমি থাকবো না, তুমি বলতে ওসব বলো না, আমি তোমাকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারবো না। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। সেদিনের সে (দুর্ঘটনার) কথা ভাবলে, আজও নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। তোমার কথা মনে পড়লে, চোখের জল আজ আর বেগ মানে না। আজ বেশ কয়েকদিন হলো, তুমি আমাকে আর খোঁজনি। ফোনের কলবুকে তোমার নাম আজ কয়েকদিন দেখিনি। তবে আজ কিভাবে, আমাকে একবারও না দেখে রয়েছো তুমি একা।

গোলাপদিন/ পুলক মণ্ডল

ওরা দুজনেই রোজ বসে ফুটপাথে। একজন মুখোশ বিক্রি করে, রঙ-বেরঙের—দেবু, অন্যজন রজনী—বিক্রি করে ফুল, গোলাপ। ব্যস্ত শহরের অফিস ফেরত বাবুরা, ঘরোয়া মানুষজন, এমনকি কলেজের হালফ্যাশনের তরুণ-তরুণীরাও মাঝে মধ্যে আসে ওদের কাছে। নেড়েচেড়ে দেখে, দুটো-একটা কথা বলে, কেনেও কিছু কিছু। আজ ওর, মানে রজনীর কাছে গোলাপের চাহিদা ভীষণ। কথায় কথায় জানতে পারে, আজ নাকি ভালোবাসার মানুষকে গোলাপ দিতে হয়। সে যাইহোক, সব গোলাপ বিক্রি হয়ে যাবে ভেবে খুশি হয় সে। তবে দেবুর কাছে আজ খদ্দের নেই বললেই চলে। একবার আড়চোখে দেখে নেয় রজনী। বড় শান্ত আর মিষ্টি ছেলে দেবু, কখনো রজনীর ভরা যৌবনের দিকে গিলে খাওয়া চোখে তাকায়নি সে। তাই রজনী নিশ্চিন্তে এতগুলো মাস তার পাশে বসে ব্যবসা করে যাচ্ছে। হঠাৎ কি মনে হলো রজনীর, সে আলগোছে একটা গোলাপ সরিয়ে রাখে, ভাবে বাড়ি ফেরার সময় এটাই সে দেবে দেবুকে, আর বলবে তুই কি ভালো। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল রজনী, হঠাৎ দেখে তার সরিয়ে রাখা গোলাপটা কখন তুলে নিয়ে ফুটপাথের অন্যদিকে যাচ্ছে দেবু। মনটা ভেঙে যায় তার, দেবুর তাহলে গোলাপ দেবার জন্য অন্য কেউ আছে।

রজনী দেখে ফুটপাথের উল্টোদিকে রোজকার মতো হাঁটতে বেরিয়েছে সেই বুড়োবুড়ি। হাতে হাত ধরে আস্তে আস্তে...অবাক চোখে সে দেখে দেবু ঐ গোলাপটা ওদের হাতে তুলে দিচ্ছে...রজনীর চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে। পড়ন্ত বিকেলের গোধূলি আলোয় একবিন্দু মুক্তোর মতো আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে রজনীর মায়াবী চোখ থেকে। সে ভাবে, দেবুর মনের মধ্যেই তো একটা মস্ত গোলাপ বাগান।

পাল্টে গেল কি/শ্যামসুন্দর গুঁই

ঘরে আয়নার সামনে চন্দনা দাঁড়িয়ে। তার উরু নিতম্ব জঙ্ঘা নাকি মুখাবয়বের কমনীয়তার সৌন্দর্য কোনটা আকর্ষণীয় বেশি। কি লজ্জা, কি গ্লানি! বন্ধুরা যদিও বলে, তাকালে মুখ ফেরানো যায় না। তবু কিভাবে আজ বাসে অঘটন ঘটে গেল। পায়েল বলত তোর পকেটমারি হবার ভয় নেই। অন্তত দশজোড়া চোখ রঙ রূপ সুধা গিলতে তোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই প্রশস্তি বাক্যে চন্দনা এতকাল গা ভাসিয়ে দিয়েছে, হাল্কাচালে ব্যাগ খুলে নির্বিকার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ভাড়া কেটেছে কনডাকটরকে অযাচিতভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে। আজই তার ব্যাগ কেটে পার্সটা উধাও হয়ে গেল। তবে কি যে দশ জোড়া চোখ তাকিয়ে দেখে তারা সব অন্ধ হয়ে গেল নাকি দেখেও নিস্পৃহ হয়ে প্রতিবাদ করার ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেল। সত্যিই কি মানুষ পাল্টে গেল!

একটি জন্তু—ম্যান, ড্যাড হল।

শিশুটি হামাগুড়ি দিচ্ছে...মেঝের ওপরে, কখন লুকিয়ে, সুঁচ ফেলে রাখলো। মা টি খুবই ঈশ্বরনির্ভর।

সদা সর্বদা ঈশ্বরকে বলে যে তিনি যেন তার পুত্রকে রক্ষা করেন। তাই, তার নজরে এলো, ঠিক সময়ে সুঁচটি। আর একটু দেরি হলেই, ছেলের কচি হাতে গেঁথে যেতো। মা তুলে নিল ছেলেটির হামাগুড়ির পথ থেকে।

এবার হামাগুড়ির পথে ঝট করে ফোনের তার টানলো। শিশুটির পায়ে, হাতে জড়িয়ে যেতে লাগলো। মা টি চেষ্টা করলো ওগুলিকে ওপর দিয়ে টানার। কিন্তু তার ওপরে নির্যাতন করলো। তাই মা টি তা করতে পারলো না।

বাচ্চাটি ডাস্ট এলার্জির জন্য তখন চিকিৎসাধীন। ডাক্তার বলেছেন, ট্রিটমেন্ট করালে কয়েক বছর পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। রাতে একটি মশারির মধ্যে তিনজনে শুতো। এত নিচু যে হাঁটু মুড়লে শুয়ে শুয়ে মশারির ওপরটা হাঁটুতে ঠেকে যায়। কারেন্ট অফ হয় রোজ রাতে, কয়েক ঘণ্টা, নিয়মিতভাবে। অনেক করে পায়ে ধরে বলা সত্বেও মশারিটিকে কিছুতেই উঁচু করতে দিল না। এরপর উচ্চশব্দে নাক ডাকা। বাচ্চা ছেলেটি চমকে উঠে কেঁদে উঠতো। মা অনেক অনুনয় বিনয় করেও ড্যাডকে অন্য রুমে শোয়াতে পারলো না। বেশি জোর করলে মায়ের হাত ঘুরিয়ে পিছন দিকে করে চেপে ধরে রাখতো। মা টি বলতো, "ছেড়ে দাও। আর বলবো না। লাগছে।" আর এমন ঘুমতো যে পাশ ফিরে যেই শুতো মা টি বিছানা থেকে নিচে পড়ে যেতো। আর শিশুটির গায়ে মোটা ভারী ড্যাড-এর পা-তোলা—সে শ্বাস নিতে না পারায়, ছটফট করছে। মা পা সরিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিতো। মাথায় মশারির ছোঁয়ার জন্য নিচু করেই থাকতো। হাতে হাতপাখা চলছে।

আর বাইরের পরিচিত সবার কাছে এমন বলতো যেন পুত্র তার অতি প্রিয়। মা টি চুপ করে শুনতো। মুখ খুললেই অত্যাচার যে!

ক্যান্সার/ মৌসুমী মণ্ডল দেবনাথ

সকাল থেকেই টানা বৃষ্টি, ঝমঝম ঝমঝম ভাসছে শহর, ভিজে ভিজে গাছেরা। নার্সিংহোমের জানালা জুড়ে বৃষ্টি, ভিজছে আমার শরীরের ক্যান্সারও। মনে পড়ছে বৃষ্টি মাথায় পড়াতে আসতেন মিহির স্যার। পড়াতেন লাইফসাইন্স। গাছপালার কথা, মানবদেহের ফিজিওলজিক্যাল তত্ত্ব। একদিন খবর এসেছিলো স্যার নেই, ক্যান্সারে মারা গেছেন। সেদিনও এমনি একদিন ছিলো, বাইরে বৃষ্টি ঝমঝম ঝমঝম।

ঝমঝম ঝমঝম।

মন যা চায়/সিলভিয়া ঘোষ

বিদায় বেলায় বিষাদ সুরে সারা বাড়ি প্রায় ম্রিয়মান, মেয়ে চলে যাচ্ছে তার শ্বশুরবাড়িতে। ফলে গতকাল বাড়িটা ছিল আলো ঝলমলে লোকজনের চ্যাঁচামেচিতে ভরপুর একটা জীবন্ত বাড়ি, আজ তেমনই ইঁট কাঠ পাথরের নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দের একটা জড় বস্তু বলেই মনে হচ্ছে তাকে। পিন পড়ার নৈঃশব্দকে ভেদ করে সবার কানে এলো 'আমার আই ফোনটা, আমার আই ফোনটা' ...চিৎকার করছে বছর চব্বিশের সানি।

অন্তরা আর সানি দুজনেই প্রচণ্ড বন্ধু। কেউ কাউকে ছাড়া থাকেনি এতদিন। সানির দামী আই ফোনটা পাওয়া গেলো না তো গেলোই না।

বিদায় বেলায় অন্তরা একা বেশ কিছুক্ষণ ঘরের দেয়ালে টানানো পূর্ব পুরুষদের ছবির দিকে চেয়ে আছে। দুচোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নামছে। নতুন বর সৌমেন ওর পাশে এসে দাঁড়াতেই অন্তরা বলল, আমার ঠাকুরদা, তাঁর বাবা ও ঠাকুরদা এক সময় শলপের (বাংলাদেশের) ডাকাত ছিলেন জানো।

এ বাড়িতে এসে কানাঘুষো শুনতে পারছে, গতকাল রাঙা বৌমা নতুন বৌয়ের হাতের সাথে হাত মিলিয়েছিল, আজ তার সোনার আংটিটা নেই...

অন্তরার হাতটা এখন সৌমেনের ঠাকুমার হাতির দাঁতের নক্সাকাটা বাক্সের ওপর, চোখদুটো তার ঝলমল করছে বেশ।

হৃদপাষাণ/রিয়া ভট্টাচার্য

আর্কিওলজি নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার কাজে সোহিনীকে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। এবার সে এসেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামে, সঙ্গে পাঁচজন বন্ধু ও একজন অধ্যাপকের বড় দল। গ্রামে সকলের থাকার ব্যবস্থা করেছেন আদিত্যনারায়ণ সিংহ, তিনিই গ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। ওনার ঠাকুরদা মহেন্দ্রনাথ সিংহ ছিলেন দাপুটে জমিদার। ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে এলাকায় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন তিনি।

ভগ্নপ্রায় সিংহদরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশের পর গাটা কেমন যেন ভারী হয়ে এল সোহিনীর, ওদের দলটা ব্যাগপত্র নিয়ে তখন এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে সোজা এগোনোর বদলে বাঁদিকের জঙ্গলটার দিকে এগিয়ে গেল সোহিনী।

এদিকে অগুন্তি গাছের সমাহারে দিনের বেলায় ঘনিয়েছে আঁধার, নাম না জানা পাখির ডাকে মাঝে মাঝেই চমকে ভেঙে যায় আরণ্যক নিস্তব্ধতা। চোখের মণি স্থির রেখে সেই পাতাঝরা এবড়োখেবড়ো পথে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলে সোহিনী, মাথার

ওপর ঝরাপাতার সঙ্গে বৈশাখী দুপুরে খসে পড়ে কিছু রক্তলাল পলাশ। কিছুটা এগোনোর পর বাঁধানো দিঘির কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় সোহিনী। এক কিশোর ঘাটে বসে বাঁশি বাজায় আনমনে। সোহিনীকে দেখে এগিয়ে আসে। দুচোখের পাতায় এঁকে দেয় শীতল চুম্বন, তারপর আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে।

তিনদিন পর আবার কোলকাতার উদ্দেশ্যে ফিরে চলেছে সোহিনীদের দলটা, পেছনের সিটে এক বান্ধবীর কাঁধে মাথা এলিয়ে শুয়ে আছে সোহিনী, চোখ ভাসছে অশ্রুজলে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা অনেক খোঁজাখুঁজির পর সোহিনীকে দিঘির পাড়ে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করে বন্ধুরা, দুদিন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে চলে সোহিনী। জানা যায় মহেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সমাপ্তির সঙ্গে এক রাখাল বালক কাঞ্চীর প্রেম মেনে না নিয়ে কাঞ্চীকে ওই দিঘির জলেই সলিল সমাধি দেন জমিদার, আর কন্যাকে সুপাত্রস্থ করেন।

শেষ হয়েছে কাঞ্চীর অপেক্ষা, এবার হয়তো সে জন্ম নেবে অন্য কোনো ঘরে। জাতিস্মর সোহিনী তার জন্য অপেক্ষা করবে কি না সময়ই দেবে তার উত্তর।

নন্দিনী/ জামান আশিক এলাহি

"তোমায় হৃদমাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না" হঠাৎ ফোনের রিংটোনটা বেজে ওঠে। আননোন নম্বর। রিসিভ করতেই কানে ভেসে আসে 'কেমন আছো?' কথাগুলো কেমন চেনা চেনা মনে হয়। হুমম্ ভালো আছি। কে তুমি?

—চিনতে পারছো না? আমি নন্দিনী।

—হ্যাঁ পেরেছি। বলো কেমন আছো?

—খুব ভালো আছি।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ...ওপার থেকে লাইনটা কেটে যায়। ত্রিশ বছর আগের সেই না বলা কথাগুলো আর বলা হয় না। তা অপ্রকাশিতই থেকে যায়...

দূর দ্বীপবাসিনী/ সুনির্মল বসু

আমার নাম সুনয়না, বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়েসন্তান আমি, ওরা আমাকে নাচ, গান, পড়াশোনা সব শিখিয়েছেন, আমি আকাশ বলে একটি ছেলেকে ভালোবাসতাম, ও তখন বেকার, বাংলায় এম এম পড়ে, কবিতা লেখে। বাবা-মায়ের ইচ্ছাতেই, এক ডাক্তারের সঙ্গে আমার বিয়ে হোল, বাবা-মা কষ্ট পাবেন বলে আমাদের ভালোবাসার কথা বলতে পারিনি। নতুন সংসারে দজ্জাল শাশুড়ি আর ননদের পাল্লায় পড়লাম। তিনি বাড়ি থাকেন না, সারাদিন রুগি দেখে বেড়ান।

শুনেছি আকাশ এখন নামকরা কবি, বিয়ে করেনি। পাড়ায় একটি অনুষ্ঠানে ও

কবিতা বলতে এল। বরের সঙ্গে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। ওকে দেখলাম, সাদা চুল জুলফি। বড় ভালো বলল। ভিড়ের মাঝে আকাশ আমায় দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না। আমার একবার ওকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

এখন সন্ধ্যা। আমি বাড়ির জানালায়, বাঁকা চাঁদ, তারা, সুপারি বন, বাঁশবনে পাখিদের কান্না, ভাবছিলাম বাবা-মাকে খুশি করতে গিয়ে আমার মতো কত মেয়েকে ভালো থাকার অভিনয় করতে হয়।

ডাক্তারবাবু ফিরলেন, —সেকি তুমি কাঁদছিলে?

বললাম, চোখে মনে হয় পোকা পড়েছে।

শরীর/তাপসকিরণ রায়

বরেন জানে, এই শরীর—এটা না হলে কিছুই নেই—ভালোবাসার জন্ম তো আসলে শরীর থেকে। অনিমা তা বোঝেনি। সে বলেছিল—এই তুমি আমার গায়ে হাত দিলে কেন?

বরেন বলেছিল, তোমায় ছুঁয়ে দেখি ভালোবাসা জাগে কি না—

অনিমা সেদিন রেগে গিয়েছিল, বলেছিল, তুমি শরীর চাও, আমায় ভালোবাসো না, বরেন।

বরেনকে সেদিন ফিরে যেতে হয়েছিল। এমনিভাবে কয়েকটা যুগ পার হয়ে গেল। একদিন পথের মাঝে বরেনের সঙ্গে হঠাৎই অনিমার দেখা হয়ে গেল। সেদিন অনিমা ম্লান হেসে বলল, বরেন, সেদিন তোমায় ভুল বুঝেছিলাম।

ধর্ম/দয়াল পাণ্ডা

বহুদিন আগে এই গ্রামে এসেছিল। ব্রজবাবু নদীর ধারে একটু জায়গা দিয়েছিল। তা থেকে সবাই জানতো পুলিশের লোক। বউ ছিল না, একটি বছর সাতেকের ছেলে ছিল। নাম পরমানন্দ। কাজ ছিল ভোরে পাড়ায় নাম দেওয়া আর মেলায় মেলায় মাটির পুতুল বিক্রি করা। সেই দয়াল কাল রাতে সাপের কামড়ে মারা গেছে।

পাড়ার ছেলেরা দাহের জন্য নিয়ে এসেছে। পাশে পরমানন্দ মুখাগ্নির জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিতায় চাপানোর আগে পাশে মাটিতে শুইয়ে সবাই মিলে উলঙ্গ করতে গিয়ে আঁতকে ওঠে। দয়ালের একটা বিশেষ অঙ্গের দিকে নজর পড়ে...মুসলমান।

চকিতে সবাই পরমানন্দের উপর ঝাঁপিয়ে তাকে উলঙ্গ করে দেয়।

না, এ ব্যাটা হিন্দু।

মৃত পিতার উলঙ্গ শরীরের সামনে সজল চোখে উলঙ্গ পুত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শবদাহ সাময়িকভাবে থেমে যায়।

অভিনয়/ সোমনাথ বেনিয়া

এক অভিনেতা স্বপ্নে দেখলেন একটি দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য যে ভূমিকাটি পেলেন তাতে তিনি ভীষণ খুশি। একটি পৌরাণিক চরিত্রে ঋষির ভূমিকা যার নন্দিত দৃষ্টিতে কোনো নারীর গর্ভবতী হওয়ার ঘটনা রয়েছে। কিন্তু এক তীব্র উৎকণ্ঠায় তার সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। বাস্তবের রূঢ় পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পারেন সেই অভিনয় কোনোদিন সম্ভব নয়। এতদিন ধরে তিনি শুধু শোকের চরিত্রে অভিনয়ে কান্নার ভূমিকা পালন করে এসেছেন। শুধু কান্না। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কান্না! দীর্ঘদিন ধরে এই কান্নার ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে কখন যে তার চোখের দৃষ্টি ফুরিয়ে গিয়েছিল তিনি বুঝতে পারেননি।

এখন তিনি বাস্তবিক অন্ধ। নতুন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই। দৃষ্টিধারী যত সহজে দৃষ্টিহীনের অভিনয় করতে পারে, দৃষ্টিহীন কেউ তত সহজে কি দৃষ্টিধারীর অভিনয় করতে পারবে?

ওই প্রশ্নের উত্তরে সে বরং এরকম একটি চরিত্র অভিনয় করার সুযোগ পেলে সত্যিকারের খুশি হবে বলে তার মনে হচ্ছে যে একজন দৃষ্টিহীন, সর্বশক্তিমানের কাছে তার হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছেন।

দেখা যাচ্ছে এই চরিত্রটি পাওয়ার আশায় শয্যাশায়ী সেই অভিনেতা পুনরায় ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতেই তার ঠোঁটে একটি অনিন্দ্যসুন্দর হাসি ফুটে ওঠে এমনভাবে যেন তিনি একটুকরো আলোর জন্য সারা জীবনের কান্নার অভিনয়কে বাজি ধরতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন...

চতুষ্পদী/তপনকান্তি মুখার্জি

ভবেশের মতো মাতৃভক্ত ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। বিধবা অসুস্থা মাকে খুব যত্নআত্তি করে। নিজের হাতে রান্না করে মাকে খাইয়ে ভবেশ চাকরিতে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে আবার সে রান্নাঘরে ঢোকে। সারাদিন মায়ের দেখভাল করার জন্য একজন বয়স্কা মহিলা থাকে।

মায়ের প্রতি মনোযোগ কম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক বয়েস হয়ে গেলেও বিয়ে করতে ভরসা পায়নি ভবেশ। কিন্তু শেষে মায়ের কথা ঠেলতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করে বসলো সে। তিন চার মাস যেতে না যেতেই ভবেশের আধুনিকা রূপসী বৌয়ের সঙ্গে মায়ের খটাখটি শুরু হয়ে গেলো। ভবেশ পড়লো মহা ফ্যাসাদে।

শেষপর্যন্ত পথও বার করল সে। মাকে আলাদা করে দিলো। গ্রামের বেশিরভাগ লোক ভবেশের এই দাওয়াইয়ে অবাক হয়ে গেল। তবে কেউ কেউ বললো, ঠিকই তো ভবেশ যে এখন চতুষ্পদী হয়েছে।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছে, ঠিক তখনই যেন আকাশ বিদীর্ণ করে বাজ পড়ল, এ কী! ক'টা বাজে?

অণ্বেষা ভেবেছিল, ও তো মাঝে মাঝেই জোরে কথা বলে। ঘুম থেকে উঠেছে বলে হয়তো বুঝতে পারেনি, তার গলার স্বর কতটা চড়ে গেছে। ও হয়তো জানতে চাইছে, ক'টা বাজে। তাই এক ঝলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, ন'টা বাজতে বারো।

—মানে?

মুখ বিকৃত করে অরণ্য এমনভাবে 'মানে'টা বলেছিল, ঘাবড়ে গিয়েছিল অণ্বেষা। বুঝতে পেরেছিল, আবার কোনও একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। কিন্তু কী ভুল করেছে, সেটা বুঝতে পারছিল না। তাই চুপচাপ গুটিগুটি পায়ে অরণ্যর কাছে এগিয়ে এসে 'কী হয়েছে?' যেই জিজ্ঞেস করতে যাবে, অমনি আকাশ কাঁপিয়ে আর একটা বাজ পড়ল, তোমাকে আমি কাল রাতে কী বলেছিলাম?

মিনমিন করে অণ্বেষা বলল, কী?

— কী মানে? এর মধ্যেই ভুলে গেলে? তোমার মাথায় কি কিচ্ছু থাকে না, নাকি? কাল বললাম না, সক্কালবেলায় ডেকে দিও। সূর্যোদয় দেখতে যাব।

— আসলে আমার যখন ঘুম ভাঙল, তার অনেক আগেই সূর্য উঠে গিয়েছিল।

— উঠুক। তাতে তোমার কী। আমি যখন তোমাকে বলেছি ডেকে দিতে, ডাকোনি কেন?

— না, মানে... তুমি ঘুমোচ্ছিলে...

— ভারী অদ্ভুত মেয়ে তো। ঘুমিয়ে ছিলাম বলেই তো ডাকবে। জেগে থাকলে কি ডাকার দরকার হয়?

— আসলে কাল অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম তো...

— কে তোমাকে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে বলেছিল? আমি বলেছিলাম? তবে?

অরণ্যর কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল অণ্বেষা। ভারী অদ্ভুত লোক তো! নিজেই কাল অত রাত অবধি গল্প করল, আর এখন বলছে কিনা, কে তোমাকে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে বলেছিল!

নাঃ। লোকটাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সকালে এক রকম তো দুপুরে আরেক রকম। বিকেলে যে কী রকম থাকবে, দশ মিনিট আগেও বোঝার কোনও জো নেই। আবার রাত্রিবেলায় কখন যে একদম একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কী রকম চেহারা নেবে, কে জানে! কী যে করি!

অণ্বেষা যখন নিজেই নিজের সঙ্গে এই সব নিয়ে কথা বলছে, তখন হঠাৎ করেই

তার স্বামী ফের বজ্রগর্ভ গলায় বলে উঠল, আমি কখনও কাউকে এক কথা দু'বার বলি না। প্রথম দিনই তোমাকে বলে দিয়েছি। শুধু তুমি আমার বউ বলে আরও একবার বলছি। ভাল করে শুনে রাখো। যা বলব, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেমন? নয়তো...

চমকে উঠল অন্বেষা। আবার 'নয়তো...' নয়তো কী? সে যদি তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে তা হলে ও কী করবে। তাকে মারবে। বকবে! নাকি খেতে দেবে না। নাকি কোনও অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাকে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে দেবে! নাকি বাড়ি থেকে বার করে দেবে। নাকি তার বাপের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলবে, অনেক হয়েছে। এ বার আমাকে রেহাই দিন। এই রইল আপনাদের মেয়ে! আমি চললাম। কী করবে ও! কী করবে!

হানিমুন থেকে ফিরে আসার পরেও খুব ভয়ে ভয়ে আছে অন্বেষা। এই বুঝি পান থেকে চুন খসল। এই বুঝি ও আবার চিৎকার করে উঠল, 'নয়তো...'

'নয়তো'র পরিণামটা যে কী সে জানে না। অথচ সেই 'নয়তো'র ঠেলায় তার জীবন একেবারে ওষ্ঠাগত। এত ভয় নিয়ে, এত সংশয় নিয়ে কোনও বউ কি সংসার করতে পারে! না, নিশ্চিন্তে একটু বসতে পারে! নাঃ। আর এত টেনশন নেওয়া যাচ্ছে না। হয় এসপার, নয় ওসপার। যা হয় একটা হবে। তাই সে দিনই সে ঠিক করে রেখেছিল, এর পরে যদি ও আবার কখনও কোনও দিন ওকে হুমকি দেয়, বলে— 'নয়তো....', তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ও মুখ খুলবে। জিজ্ঞেস করবে, নয়তো কী?

এই 'নয়তো কী' জিজ্ঞেস করার জন্যই ক'দিন ধরে অন্বেষা খুব উসখুস করছে। অরণ্য যা বলে যাচ্ছে, ইচ্ছে করেই, তা করছে না। বরং এমন উল্টোপাল্টা কাজ করছে, যাতে অরণ্যর চোখে পড়ে। পড়ছেও চোখে। আর সেটা যে পড়ছে, তা ওর ভ্রু কোঁচকানো দেখেই সে তা টের পাচ্ছে। অথচ অরণ্য কিছুই বলছে না।

অন্বেষা একেবারে অবাক। সে যখন না জেনে, না বুঝে এটা ওটা করত সেটার জন্য ওকে প্রায় প্রতি পদে পদে অপদস্ত হতে হত। কথা শুনতে হত। স্বামী রেগেমেগে শেষ পর্যন্ত বলত, 'নয়তো'....

অথচ এখন ইচ্ছে করে ও যখন ভুলভাল কাজ করছে, অরণ্যর মুখ থেকে শুনতে চাইছে, 'নয়তো...', তখন কিনা তার স্বামী একেবারে নিশ্চুপ। ব্যাপারটা কী! ও যদি এই ভাবে চুপচাপ থাকে, তা হলে যে তার জানাই হবে না, নয়তো কী করবেও। তাই আজ মাছ রান্না করার পরে বাটিতে বাটিতে আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে সে। শুধুমাত্র স্বামীর মাছের বাটিতে এত লঙ্কার গুঁড়ো আর কাঁচালঙ্কা মিহি করে বেটে মিশিয়ে দিয়েছে যে, শত চেষ্টা করলেও তার স্বামী যাতে আর চুপ করে থাকতে না পারে, ঝালের চোটে মুখে যা আসবে, যেন বলে ফেলে। আর তার সঙ্গে যেন বলে ওঠে—নয়তো...

অন্বেষা যা চেয়েছিল, তাই হল। প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই থালার পাশে থু থু করে সবটা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে অরণ্য বলে উঠল, এটা কী করেছ? মাঝের ঝোল? না আমার গুষ্টির পিণ্ডি? এত ঝাল কেউ দেয়? মনে হচ্ছে, বাজারের সব লঙ্কা বেটে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছ। এখনও বলছি, ঠিক মতো রান্না করা শেখো। নয়তো...

ব্যস। এই একটা শব্দেই জন্যই এতক্ষণ ধরে যেন অপেক্ষা করছিল অন্বেষা। যেই অরণ্য বলল, 'নয়তো...', অমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চড়া গলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্বেষা বলে উঠল, নয়তো কী? কী করবে?

এ রকম একটা প্রশ্ন শোনার জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না অরণ্য। শুধু প্রশ্ন নয়, এতদিন ধরে তার স্ত্রী যে টোনে তার সঙ্গে কথা বলত, তাতে তার মনে হয়েছিল, সে আর কোনও দিনই ওর সামনে গলা তুলে কথা বলতে পারবে না। কিন্তু আজ সে-ই এভাবে প্রশ্ন করায় অরণ্য একেবারে থতমত খেয়ে গেল। এ রকম পরিস্থিতিতে কী বলবে বুঝতে পারল না ও। গলার স্বর একদম খাদে নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, নয়তো... নয়তো... নয়তো... বলে, যে ভাবে কথা হাতড়াতে লাগল, মনে হল, ও নিজেও জানে না, নয়তো কী করবে ও। তাই ফট করে বলে ফেলল, নয়তো... যা দিয়েছ, চুপচাপ খেয়ে নেব।

থমকে গেল অন্বেষা। যে শব্দটাকে এত ভয় পেত সে, যার পরিণাম নিয়ে মনে মনে এত কিছু ভেবেছে, দিনের পর দিন সংশয়ে কাটিয়েছে, রাতে ঠিক মতো ঘুমোতে পারেনি, সেটা আসলে এই।

হাসি পেয়ে গেল তার। মুখে বলল, থাক। ওটা আর খেতে হবে না। পাশে সরিয়ে রাখো। আমি অন্য বাটি নিয়ে আসছি। বলেই, রান্নাঘরের দিকে চলে গেল অন্বেষা। দরজার কাছে বাঁক নেওয়ার আগে স্বামীর অসহায় মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

প্রবাসী কাদের কাকা, দীর্ঘদিন ধরেই প্রবাসী। তিনি না কি আবার শখের শিকারি। বিভিন্ন জঙ্গলে শিকার করে বেড়ান। শুনেছি, দু'একবার সংরক্ষিত পশু শিকারের দায়ে জেল হাজতও হয়েছে। তবুও গ্রামে আসলে তিনি সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। আয়ের সঠিক উৎস জানা না থাকলেও এলাকায় তিনি ধনী লোক বলেই বহুল প্রচলিত। এবার গ্রামে এসেছেন কিছু পৈতৃক জমি-সম্পত্তি বিক্রি করতে, শখের ব্যবসা করতে গিয়ে না কি লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে টান পড়েছে। আমার দূর-স্থানীয় এক আত্মীয় ওই জমি ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বায়না বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন কাদের কাকা-কে। কিন্তু ধনী সম্মানীয় লোক বলে কোনো বায়না পত্র করার কথা বলতেই পারেননি আমার বুদ্ধিমান আত্মীয়টি। এদিকে প্রবাসী কাকা আবার প্রবাসে নিরুদ্দেশ। দীর্ঘদিন গ্রামে আসার নাম গন্ধ নেই।

সন্ধ্যার পর প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আড্ডা মারতে আসেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাস্টার বনঅলি। কথায় কথায় আমার বুদ্ধিমান আত্মীয়টি পাড়লেন ওই জমি ক্রয়ের কথা —জানেন দাদা, কাদের দা তার বোনের জমি আমাদের বিক্রি করতে চাইছে, বিতর্কিত জমি আমরা নেব কেন বলুন তো? বায়নার টাকা ফেরত চাইতেই, অস্বীকার করছে। এখন স্বীকারই করাতে পারছি না। যে টাকা দিয়েছি।

—সাহিত্যিক কাকা সহসা বলে উঠলেন—"শিকার তো উনি করেছেন।"

—"না, দাদা, স্বীকার উনি করছেন না।"

সাহিত্যিক কাকা আবার বলে উঠলেন—"আমি দেখতে পাচ্ছি উনি শিকার করেছেন আর তুমি বলছো না?"

—"আপনি কী বলছেন দাদা? স্বীকার করলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।"

—"আহা। তুমি বুঝতে পারছো না উনি সত্যিই শিকার করেছেন।"

—"ধুর। আপনি কী যে হেঁয়ালি করছেন দাদা, সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

—সত্যিই তুমি বুঝতে পারছো না? সাহিত্যিক কাকা স্মিত হেসে বললেন— "আরে উনি তোমাকে স্বী..কা..র না করে শি...কা..র করছেন।"

—"তার মানে?"

তার মানে আমার বুদ্ধিমান আত্মীয়টি বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পেরে পাশ থেকে হো-হো করে হেসে উঠলাম।

— বাবা আমি স্কুলে যাবো না। স্যার আমাকে খুব শাসন করে। পুরো ক্লাস বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে। আমি আর স্কুলে যাবে না।

— কিন্তু বাবা কিছু ভুল করো তাই তো তোমাকে শাসন করে, শাস্তি দেয়। তুমি এই রকম কাজ করো কেন?

যাহ বাবা। এতো পুরো গুবলেট হয়ে গেল। বাবাও দেখি স্যারের হয়েই বলছেন। অগত্যা মাথা নিচু করে ব্যাগের বোঝা কাঁধে তুলে বাধ্য ছেলের মতো স্কুলের পথে পা বাড়ালো অনিকেত।

ভীষণ চঞ্চল আর পড়াশুনোয় ভিতু অনিকেতকে সবাই অনি বলেই ডাকে। পথের উপর ছড়িয়ে থাকা পাথর টুকরোগুলোকে বলের মতো করে ছুঁড়ে খেলতে খেলতে যখন স্কুল পৌঁছালো ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। স্যার অনিকে দেখেই ব্যঙ্গ করে বললো

আজকে আবার কি বাহানা দেবে? মনে করে এসেছো তো।

অনি মাথা নিচু করেই রইলো। স্যার আবার ধমক দিয়ে বললো মুখে রা নেই কেন?

অনি এই রকম পরিস্থিতি সামাল দিতে জানে। বেশ করুণ সুর করে বললো।

আজ সকালে বাবা ভীষণ অসুস্থ হয়ে গেছিলেন। ওনাকে হসপিটালে দিয়ে আসতেই দেরি হয়ে গেল।

ঔষধে কাজ করেছে। স্যার আর কিছু জানতে চাইলেন না। শুধু বললেন এই অবস্থায় স্কুল আসার দরকার ছিল না। যাও হাসপাতালে বাবার কাছেই থেকো। আমি হেড স্যারের সাথে কথা বলে নেবো।

এই সুযোগটাই অনি চাইছিল। ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ওর দুই মিনিট সময় লাগলো না। সোজা গিয়ে হাজির হলো নিমাইদের পুকুর পাড়ে। আজ অগ্রিম মাছ ধরার প্ল্যান ছিলো। এই সুযোগ বার বার আসে না। তাই মাছ ধরে বিশু খুড়োর বাগানের পেয়ারা সাবাড় করে কুমোরদের গোটা চারেক কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে ঠিক স্কুল ছুটির সময় বাড়ি এসে ঢুকলো।

কেউ জানতেও পারলো না, সারা দিন কতো ফুর্তিতে কেটেছে। বিকেলে আবার মাঠে ফুটবল খেলতে বেরিয়ে গেলে মা এক গ্লাস দুধ দিয়ে বললো—

আহা। ছেলে আমার স্কুল থেকে এসে খিদেতেই রয়েছে। অনির ফিক করে হাসি বেরিয়ে যাচ্ছিল। সত্যি আজকে বাহানা কিন্তু মোক্ষম হয়েছে। স্মরণীয় একটা দিন।

সব কিছু ঠিক যাচ্ছিল। কিন্তু সন্ধ্যের সময় রাহু হঠাৎ মাথার উপর এসে নাচবে অনি বুঝতে পারেনি। ঘরে এসে দেখে হেড স্যার এসে উপস্থিত হয়েছেন বাড়ির সদর

দরজায়। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই অনির চক্ষু চড়কগাছ। এখন উপায়? সব জানাজানি হয়ে গেলে তো আর ওর রক্ষে নেই। এরকম সময় অনির বুদ্ধি যে একটু বেশি কাজ করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক দৌড়ে হেড স্যারের কাছে গিয়ে টুপ করে একটা পেন্নাম ঠুকে বললো—

স্যার আপনি?

হ্যাঁ রে। তোর বাবার শরীরের খবর নিতে এলুম। এখন কেমন আছেন তিনি?

এখন মোটামুটি ভালো আছেন স্যার। কাল হসপিটাল থেকে ফিরবেন।

ওহ। তাহলে বরং আমি কালই আসবো বলেই স্যার পিছন ফিরছেন। সদর দরজা খুলে ভূতের মতো বাবার আবির্ভাব। স্যারও রীতিমতো চমকে গেলেন।

আর অনি। তখুনি একটা লম্বা ছুট। শুনেছি তিনদিন ওর টিকিটির দেখা মেলেনি।

নোমিনি ■ কৃপাণ মৈত্র

মোটর বাইকের শব্দ শুনে বিল্ববাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি পোস্ট অফিস থেকে ফিরেছেন। এখনো গায়ের ঘাম পর্যন্ত শুকোয়নি।

—কী ব্যাপার কিশলয়, কোন ভুল হলো না কি?

—কিশলয় বলে, একটা ভুল হয়ে গেছে যে।

—ভুল! এসো এসো ভেতরে এসো। দাঁড়াও তোমাকে আগে এক গ্লাস জল খাওয়াই। তা বাবা কী ভুল হল বল দিকিনি।

জলটা খেয়ে কিশলয় বলল, নমিনির ঘরটা পূরণ করতে ভুলে গেছেন। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যাপার বলে কথা।

—কিছুই ভুল হয়নি বাবা। চার ছেলে দু'মেয়ে। কেউ কারো ঘাটে জল খায় না। মরার এগারো দিন পর ওরা বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে। একটু হ্যাপা তো সামলাক।

বিল্ববাবু চোখের ইশারায় কিশলয়কে খোলা দরজার দিকে তাকাতে বললেন। কিশলয় দেখল বেশ কয়েকটা ছায়া। ঘন সন্নিবদ্ধ।

বাইক নিয়ে কিশলয় যখন সবে বড় রাস্তায় উঠেছে, চারজন মহিলা তার বাইক আটকে তার হাতে একটা কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিল। একজন বললো, এই চারজনই নমিনি হবে।

কিশলয় মুখ তুলে দেখল বিল্ববাবু তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিশলয় রাস্তায় কাগজের টুকরো ছিঁড়ে ফেলে দিল। বিল্ববাবু বেঁচে গেলেন।

বিড়ম্বনা ■ অরিত্র দাশ

৩০১৮ সাল। যমরাজের সভা। যমরাজ ল্যাপটপের সামনে গালে হাত দিয়ে বসে। ল্যাপটপে চিত্রগুপ্তের পেনড্রাইভ ঢোকানো আছে। পেনড্রাইভে এক্সেল ফাইল ওপেন করে যমরাজের বর্তমান এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্রগুপ্ত।

—স্যার অ্যাভারেজ বয়স আরো বছর কুড়ি বাড়িয়ে দিন। এমনিতেই যা পরিবেশ দূষণেই নীচের মালগুলো টপাটপ যাচ্ছে।

যমরাজ—লাভ হবে কোন? তাতে প্রোডাকশনের কি ছাই উন্নতি হবে শুনি।

চিত্র—এটা স্যার ঠিকই বলেছেন।

যম—তুমি ঠিক আর আমি ভুল হলে তুমিই তো আমার চেয়ারে বসতে চাঁদু।

চিত্র—ভাবা যায় ভারতের মত দেশের এই হাল হল?

যম—জাপান থেকে তো ওয়ার্নিং এসেছিল একশো বছর আগে। তখন কি বলেছিলে—স্যার জাস্ট চিল, চিল জাস্ট চিল।

চিত্র—ঠাণ্ডা স্যার মর্তের মানুষ মরে গেছে।

যম—ব্রহ্মা কি বলছে?

চিত্র—ব্রহ্মা স্যার প্রযুক্তির কাছে হার মেনেছে। প্রযুক্তির কাছে ব্রহ্মার সৃষ্টিতত্ব ফেলিওর।

যম—কি চায় মানুষগুলো? বুঝতে পারছে না তারা নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন করছে?

চিত্র—উন্নত জীব তো স্যার। শুধু নিজের ছাড়া আগামীর কথা ভাবে না। আগে তবু বিয়ে করে কোনোরকমে একটা নিত। এখন তো স্যার বিয়েই করতে চায় না।

যম—কেন, কেন, কেন?

চিত্র—আরে স্যার বিয়ে করলে একজোড়ার বদলে দুজোড়া মা-বাবার চাপ।

যম—দেখো হেঁয়ালি করে কথা বলো না?

চিত্র—আরে স্যার এখন ছেলে হোক বা মেয়ে সবাই বাবা-মার একমাত্র কিনা।

যম—আগে যেমন উঠতি বয়সে প্রেম প্রীতি করে দু-একটা কেস হত। সেইরকমভাবেও কিছু প্রোডাকশান হচ্ছে না?

চিত্র—স্যার প্রেম করতেও মন ও সময় লাগে। পড়ার চাপ, চাকরির চাপ, মোবাইলের চাপ এত চাপে মন আর সময়টা যে চেপ্টে গেছে। আরো একটা গভীর প্রবলেম আছে স্যার—

যম—কি?

চিত্র—যুবক-যুবতীর থেকে বুড়ো-বুড়ীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে। দেশের জি ডি পি ফল করে গেছে।

যম—নিকুচি করেছে তোর জি ডি পি-র। ওই জি ডি পি ভোগ করার জন্য কগাছা লোক পড়ে আছে? আহা কি সব দিন ছিল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে। কতগুলো করে বিয়ে কতগুলো করে বাচ্চা।

চিত্র—লিভ ইন এসে গেছে না স্যার। যদি বা বিয়ে হয় দু-চারদিনের ব্যাপার। আর কে বাচ্চা মানুষ করবে। সবাই চাকরি করে না স্যার।

যম—আয়া, কাজের লোক এগুলো দিয়ে তো আগেও বাচ্চা মানুষ হয়েছে।

চিত্র—দেশে শিল্পের জোয়ার স্যার। কে আর মান সম্মান খাটো করে লোকের বাড়ি কাজ করবে। বড়ো চাকরি, পকেট ভর্তি টাকা কিন্তু রাতে বাড়ি এসে নিজে চাল ডাল ফোটালে তবে কিছু জুটবে, কাজের চাপে সকালে উঠে ভাল করে পটি করার সময় পর্যন্ত পায় না।

যম—থাম রে থাম। ওদের দুঃখে চোখটা জলে ভরে গেল। বুঝতে পেরে গেছি আমি। চাকরিটা বোধহয় কিছুদিন পর থাকবে না। মানুষের দায়িত্ব মানুষের উপর ছাড় চাকরি গেলে আমরা কি ব্যবসা শুরু করব সেই প্ল্যানটা আমি সেরে নিই। মাইনের স্বর্ণমুদ্রা জমিয়ে রেখেছিস তো? না মোচ্ছব করে উড়িয়ে দিয়েছিস?

খাওয়ার খতিয়ান ■ মীম মিজান

তারকাচ্ছন্ন আকাশ। এশার নামাজের পর তামাই গ্রামের মেশিনচালিত তাঁতঘরগুলি আবার সচল। খটাখট শব্দ করছে। মীম প্লাজার ছাদে বসে আছি শেখ বিপ্লব হোসেন, হাসান নাজনু আর আমি। পূর্বালি দিগন্তে মুচকি হাসির রেখার মতো চাঁদটি উদিত হচ্ছে। আমরা প্রায়ই বসি এখানটাতে। আড্ডা ছাড়া আমাদের মনের গতি বাড়ে না। তাই ব্যস্তদিনের সকল ব্যস্ততাকে বাক্সবন্দী করে আমরা ভারচুয়াল যুগের মানুষ হয়েও একচুয়াল গপসপ, পরস্পর পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকি। শব্দমুখর কিশোরী রাতের উন্মুক্ত ছাদে আমরা পসরা সাজিয়ে নেই অনেক গল্পের।

মুরব্বীগোছের শেখ বিপ্লব হোসেন আজ প্রারম্ভে হেসে হেসে বলছেন, আরে ভাই জানেন না আজ অফিসে কী হয়েছে?

আপনার অফিসে কী হয়েছে তা আমরা জানব ক্যামনে? আমার জিগ্যেস।

গল্প শুরুইতো করতে পারলাম না। আর তার মাঝখানে এভাবে ফোড়ন কাটলে কিন্তু মজা পানসে হয়ে যাবে গবেষক মহোদয়। শেখ বিপ্লব হোসেনের কিছুটা ঝাঁঝালো ফিডব্যাক। আমিও কম যাই কিসে। বলে উঠলুম, আরে কবি সাব, আগে ছানার মিষ্টি খেয়ে পরে চা খাইলে নাহি পানসে লাগে? আমার কথা বা ফোড়নকাটা কি ছানার মিষ্টি? আর আপনের গল্প কি কমমিষ্টির চা?

এত যুক্তি দিলে তো ধোপে টেকা দায়রে ভাই।

আহা। শুনুন না। কী হয়েছে? বিপ্লব সাবের গল্প শুরু হলে, এভাবে।

আমার কলিগ সেলিম সাব কুমিল্লার মানুষ। ছিপছিপে গড়নের। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের কাঁচাপাকা চুলের মিডিয়াম উচ্চতার মানুষ। মোটাফ্রেমের চশমা পরেন। হাঁটার সময় বাঁহাতখানা ঝাঁকি মেরে চলেন।

এ অবস্থায় আসার পর তরুণ কবি হাসান নাজমুল কিছুটা বিরক্তিভাজন কণ্ঠে বললন, বিপ্লব ভাই, আমাদের কাছে একজন মানুষের এতকিছু বলার কিইবা প্রয়োজন পড়েছে বলুনতো? আমরা তো তার অবয়বের স্কেচ করবো না। আর আমরা আঁকিয়েও নই। সোজাসুজি বলুনতো কী হয়েছে? অবয়বের ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার লাইন ছেড়ে তখন বিপ্লব সাবের গল্পের মোড় যা বলতে চেয়েছিলেন সেদিকে হুড়মুড়িয়ে যাওয়া আরম্ভ করলো। তিনি যা চা খান তা বলার মতো নয়।

আমি কিছুটা হকচকিয়ে উঠে বললুম, কী কবি সাব আপনার কলিগ কি অদ্ভুত চাখোরকেও হার মানিয়েছে?

না, না, সেরকমটা নয়? উনি দিনে কমপক্ষে পঁচিশ কাপ চা খান।

আমার আবারও ঢুকেপড়া তার গল্পের মধ্যে। এ আবার নতুন কী? কতজনইতো বিশ-পঁচিশ কাপ চা অনায়াসেই সারাদিন চু চু করে খান।

এই হলো আপনাদের গবেষক মানুষদের একটা সমস্যা। আগাম অনেক কিছুই ধারণা করে বসে থাকেন। অপেক্ষা করে শুনুন না। গল্পটি কোথায় যায়? আমার কলিগ তো অন্য আট-দশজনের মতোই পঁচিশ কাপ চা খান। তবে তিনি যে ছোট্টকাপে চা খান তা দেখেই আমাদের ভিতরে হাসাহাসি চলে। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য যে রকম ক্ষুদ্র ফিডার আছে, ঠিক অনুরূপ শিশু সাইজের একখানি ছোট্ট কাপে তিনি চা পান করেন। আর সেই ছোট্টকাপেরও তিনভাগের একভাগ পরিমাণ চা তাকে দিতে হয়। যদি একটু আধটু বেশি হয়েছে তো বুয়ার খবর আছে।

হম্বি-তম্বি জুড়ে দেন। আমি অত চা খাই নাকি? এই গাধারা এতদিন ধরে অফিসে চাকরি করে জানে না। আর পারলাম না এদের নিয়ে।

একদিন বুয়ার হাতে পড়ে যেয়ে সেই শিশু সাইজের কাপখানি গেলো ভেঙে। বুয়াকে কত কিছু বলে যে ভর্ৎসনা করেছে তার ইয়ত্তা নাই। কী যে হা হুতশ। এই কাপ বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করতে হয়েছিল তাকে।

আমাদের সুপারভাইজার সাব আজ সেই কলিগকে ডেকেছিলেন তার চেম্বারে। কিন্ত চা পান করতে যেয়ে দেরি করে ফেলে এই বেচারা। স্যার নিজেই চলে আসেন আমাদের কক্ষে। দেখেন শিশু সাইজের সেই চায়ের কাপে চু চু করে চুমুক বসাচ্ছেন সেলিমসাব। সেলিমসাব আমি আপনাকে ডেকেছিলাম। আর আপনি এখানে চু চু করে

চা খাচ্ছেন। এরকমভাবে এর আগেও আপনি আমার ডাকে সাড়া দিতে অনেক দেরি করেছেন। আপনার এতই যদি চা খাওয়ার অভ্যেস থাকে তবে যান না বাসায়। আপনার মাকে বলুন, চা করে ছোট্টবাটিতে নিয়ে চামুচ দিয়ে আপনার মুখে তুলে খাইয়ে দিক।

সুপারভাইজার স্যার চলে গেলে সেলিমসাব মহাবিরক্তিভরা কণ্ঠ নিয়ে আমাদের বললেন, আচ্ছা আপনারাই বলেন তো খাওয়ার মধ্যে শুধু একটুখানি চা-ই খাই। তাও কারো সহ্য হয় না কই যাবে এই চা খাওয়া মানুষগুলো?

তরুণ কবি হাসান নাজমুল বলে উঠলেন, তাকে চা খাইতে কে বলেছে? চা খাওয়া ছেড়ে দিলেই তো সমাধান। আমি বলে উঠলুম, আরে ভাই যারা তা না পেলে যে কী পরিমাণ পাগলামো করে সেটা হয়তো আপনার ভালো করে জানা নেই। আমাদের গ্রামে দক্ষিণবঙ্গ থেকে একজন মাষ্টার এসেছেন। তার কাজ হলো গ্রামের কয়েকটি বাড়ির পড়ানো। মেম্বারসাবের বাড়িতে তিনি লজিং সিস্টেম থাকেন। লজিং বাড়ির খাওয়া ভালো। খাইতে খাইতে তার ভুঁড়িখানা উঁচু হয়েছে বেশ। হঠাৎই একদিন তিনি শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন। মাথা ঘুরতে লাগলো তার। চোখেও ঝাপসা দেখতে লাগলেন। অতিসত্বর তিনি আতাউল হক ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। ডাক্তারসাব ব্লাডের সুগার পরীক্ষার পর জানালেন যে মাষ্টার মহাশয়কে বহুমূত্র রোগ স্বাগত জানিয়েছেন। কাছুমাছু বদনে মহাশয় ডাক্তারের কাছে এর থেকে পরিত্রাণের চিকিৎসা উপায় জানতে চাইলে আতাউল হক ডাক্তার বললেন যে, কয়েকটি ঔষধ লিখে দিচ্ছি নিয়মিত খাবেন। আর অবশ্যই সকাল ও রাতেরবেলা রুটি খাবেন। রাতেরবেলা আপনার জন্য ভাত একেবারেই নিষিদ্ধ। সেদিন রাতেই মেম্বরের দুলালী বড়পুত্রকে দিয়ে মাষ্টার মহাশয় বাজারের হোটেল থেকে নিয়ে আনালেন সাদা রুটি ও সবজি। মেম্বর বাড়ির অভ্যন্তরে কিন্তু মহাশয়ের বহুমূত্র রোগের সুবারতা পৌছয়নি তখনো। মেম্বারের ছোট্টপুত্র লজিং স্যারের রাতের খাবারের সাজানো ডালাখানি স্যারের ঘরে পৌছে দিয়ে প্রস্থান করে। মাষ্টার মহাশয় বাজার থেকে নিয়ে আসা সাদা রুটি আর সবজি খেয়ে ফেললেন। স্যারের পাশে বসে পড়ছিলেন তখন মেম্বারের বড়পুত্র। মহাশয় মেম্বারের বড় দুলালকে বললেন, আনোয়ার, দে তোমাদের বাসার ভাতটুকুও খাই। ডাক্তার রুটি খাইতে বলেছেন, রুটিতো খাইলাম আগে। ভাত তো তারপরেই খাচ্ছি। গাপুসগুপুস করে মেম্বর বাড়ির চটকদার মজার খাবার খেয়ে ঢেকুর তোলেন মহাশয়। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দর্শনের ন্যায় মেম্বরপুত্র হা হয়ে তাকিয়ে থাকে স্যারের পানে।

আমার গল্প শুনে দু'জনেই হো হো করে হাসতে লাগলো। আমিও তাদের হাসির সাথে যোগ দিয়েই হাসতে লাগলাম। হঠাৎই চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমাদের হাসিময় মুখগুলি এক লহমায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সব ইঞ্জিনচালিত তাঁত একসাথে বন্ধ হয়ে যায়। আর আমাদের চারপাশ এক আদিম পৃথিবীর আবহে নিয়ে গেল তিন আড্ডবাজকে।

নীরবতা ভাঙ্গলেন তরুণ কবি। আপনাদের এই মজার দু'টো আখ্যান শুনে আমারও মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগে ঢাকায় এক বন্ধুর মেসে রাত্রিযাপনকালের এক ভয়াবহ হাসির ঘটনা। গরমকাল। রাজশাহী থেকে মেসে এসেছে অনেক ধরনের ফলফলাদি। রাতের মিল সেরাতে সবারই অফ ছিল। তাই বুয়াও আসেনি। রান্না পাতিলও চুলোতে উঠেনি। মেস মেম্বার আর আমিসহ মোট তেরোজনের সেরাতে ফল উৎসব পালন হলো। আম, কাঁঠাল, দুধ, চিড়া, চিনি ইত্যাদি ছিল উৎসবের উৎসঙ্গ। যে যার মতো পেয়েছি, পেটপুরেই খেয়েছি। ইকরাম উদ্দিন নামের এক ভোজনরসিক প্রায় তিন জনের সমান ফল খেয়ে ফেলে বলে উঠলেন, বাপরে, বাপ, এত খাবার মনে হয়, এ জন্মেও খাইনি। আগামীকাল না খাইলেও চলবো। মেসের কয়েকজন বলাবলি করছে, ইকরাম ভাই, আপনি কি থাকতে পারবেন এই ফলাদি খেয়ে? ভাত হইলো গিয়া আপনের ঘুমের অশুদ। পেট যতই ভইরা থাক সেখানে ভাত না ঢুকলে কস্মিনকালেও ঘুম আসে না আপনের। রাত্রে সবাই ঘুমোচ্ছিলাম। আমাদের রন্ধনশালায় কে একজন যেন কী খাচ্ছে? দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ইকরাম উদ্দিন ভাত খাচ্ছেন। মুঠোফোনের পর্দায় দেখি রাত তিনটে বেজে পনেরো মিনিট।

মুদ্রাদোষ ■ শ্যামল কুমার রায়

বাঁকুড়া মোড়ে স্টেট বাস ধরবেন বলে দাঁড়িয়েছিলেন সুকুমার সমাজপতি। পরনে একটা বেশ পুরোনো ফেডেড জিন্স আর 'আমারও পরাণও যাহা চায়, তুমি তাই' লেখা পাঞ্জাবি। পোশাকের কোনোটাই ওনার নয়, ওগুলো সবই ওনার ছেলে, দীপুর। দীপু বর্তমানে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে গবেষণারত। জামা কাপড়গুলো বাড়িতে পড়েই আছে ও আর পরবেও না, শুধু শুধু পড়ে পড়ে নষ্ট হবে, তাই গায়ে চাপিয়ে নিয়েছেন। সরমার জন্য আজকে এই আটটা পঁচিশ এর করুণাময়ী যাওয়ার স্টেট বাসটা মিস করলেন সুকুমারবাবু। খুব নড়বড়ে সরমা। স্বামী আজ বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে রুটিন চেক আপে যাবে, অতটা রাস্তা, তাই ফ্রিজের জল, পরোটা, তরকারি ব্যাগে ভরে দিল। বারবার বলা সত্ত্বেও সেই লুচি ঘুগনি করল, খাইয়ে তবে যেতে দিল। নিট ফল- স্টেট বাস মিস। বেলা বারোটাতে ডাঃ খাস্তগির এর স্যুট এ তাঁর ঢোকার কথা। সুকুমার সমাজপতি স্যারের এই দোষ। কিছু উনিশ থেকে বিশ হলে দোষ সেই সরমার।

এই বাঁকুড়া মোড়ে তো আর ক্যাব পাওয়া যাবে না, কলকাতা যাওয়ার জন্য। একরাশ বিরক্তি নিয়ে বাঁকুড়া মোড়ে অনুপ্রেরণায় তৈরি বাসস্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে মনে মনে গজগজ করতে লাগলেন। এমন সময়ে নাতনি তিতিসার ফোন বেজে উঠল। দাদাই

তুমি কুন্দুর? কোন সকালে উঠে পড়েছি, তুমি আসবে বলে। তুমি আসবে, তাই মা আজ আমায় দুষ্টুমি করতে বারণ করেছে।

ঠিক আছে, দিদিভাই, আমি কোলকাতা পৌঁছে তোমায় ফোন করব।

মনটা বেশ খুশিতে ভরে উঠল। বাঁকুড়া মোড়ে নানা রকম মানুষজন, চেঁচামেচি সবারই বাস ধরার তাড়া। ঠিক এই সময়ে একটা টকটকে লাল রঙের মরিস গ্যারাজ -এর হেক্টর এসে দাঁড়াল। কালো কাঁচ নামিয়ে কে তাকাচ্ছে? হঠাৎই ঢিপ করে প্রণাম করে বলে উঠলো, স্যার, চিনতে পারছেন? প্রাথমিক ঘোর কাটিয়ে স্মৃতির সরণি বেয়ে ছুটতে লাগলেন সমাজপতি স্যার। ওহঃ! বাচাল বাদশা। কোথায় যাবেন? ই.এম বাইপাসের ওদিকে, হেলথ চেকআপে। আমি তো এয়ারপোর্ট যাচ্ছি, উঠে আসুন, গাড়ি পুরো খালি।

সামনে আসুন, স্যার। হেক্টরে চড়ে বসলেন সবার প্রিয় সমাজপতি স্যার। বাদশা স্যার এর জন্য গাড়িতে হালকা করে রবীন্দ্র সংগীত চালিয়ে দিল। স্যার, স্কুলের খবর কি? হেডস্যার, রবীনবাবু, তামান্না ম্যাম কেমন আছেন? আলমের মুখ ফস্কে শুধু বেরিয়ে গেল, আর মিনু মাসি? থুড়ি, 'মি'-তেই আটকে গেছিল। সামলে নিয়ে বলল আর মিনতি ম্যাম? সাধারণত, কলিগদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলা সুকুমার সমাজপতির স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না, সমাজপতি স্যার। স্যার আপনিও হাসছেন? মনে পড়ে গেল রে। ঐ রকম বয়োবৃদ্ধ মিনতিদি (মিনতি চট্টরাজ)-কে পর্যন্ত তোরা খেপিয়েছিলি। আমি নয়, স্যার, ডালিয়া। উনি এইট বি তে কর্মশিক্ষার ক্লাস নিতেন। আর ক্লাসেই সেলাই করতে করতে ঢুলে পড়তেন, তখনই মেয়েরা মিনু মাসি ঢোলে, ক্লাসেতে এলে— বলে প্যারোডি করত। একদিন তো উনি বলেই বসলেন, আমি জানি, তোরা আমায় কি বলে ডাকিস, তোরা কি এটা ঠিক করছিস? এটা বলেই তো উনি মেয়েদের বলা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁরে, বাদশা, সংসার করেছিস? হ্যাঁ স্যার, আপনার সালমাকে মনে আছে? আমি যেবার নাইনে পড়া ছাড়লাম, তার দু'বছর পর একটা মেয়ে স্কুল থেকে পালিয়েছিল, সেই সালমাকে আমিই নিয়ে গেছিলাম তুলে। আমরা ভালোবেসে বিয়ে করেছি। আসলে স্যার, পড়েছি তো স্কুলে অনেক স্যারের কাছেই, খুব কম জনই আপনার মতো বই-এর বাইরে ছাত্রছাত্রীদের বন্ধু হতে পেরেছেন। ওদিকে ঠিক এই সময়ে মিউজিক সিস্টম এ ভেসে উঠল, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তাই সকলখানে।"

মনে মনে হাসতে লাগলেন সমাজপতি স্যার। নিজের দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে বহু স্কুলে শিক্ষকতা করার সুবাদে বহু ঘটনার তিনি নির্লিপ্ত সাক্ষী। তার এক সহকর্মী একবার বেশ বড়ো গোঁফ রেখেছিলেন বলে ছাত্ররা ওনাকে কুবলাই খান বলে ডাকত। স্যার, আপনার উদ্দোলক কে মনে পড়ে? সায়েন্সে সেই ফাইভ থেকেই খুব ভালো ছিল কিন্তু

ও বাংলা পড়তে চাইত না। আর দেবনাথ স্যার ফার্স্ট পিরিয়ডে ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে ক্লাসে খুব দ্রুত হেঁটে আসতেন বলে, উদ্দোলক তো ওনাকে আড়ালে মেইল ট্রেন বলত। এটা উদ্দোলক-এর গাড়ি, স্যার ও এখন দিল্লির এইমসের ডাক্তার। কালী পুজোতে পাত্রসায়রে দেশের বাড়ি আসছে। ওকেই এয়ারপোর্টে আনতে যাচ্ছি। আপনাকে যশোর রোডে ড্রপ করে ক্যাব বুক করে দেব। না আমি পারব। স্কুলের এই নেক্সট জেনারেশন সহকর্মীদের পাল্লায় পড়ে আমিও টেকস্যাভি হয়ে গেছিরে। জানিস, বাদশা, জীবনের প্রথম দিকে একটা স্কুলে শর্ট টার্ম ভ্যাকেন্সিতে ঢুকেছিলাম, প্রচুর উদ্যম ছিল। দল বেঁধে ছেলেরা টয়লেট থেকে ফিরলে 'আয় রে আয়' বলে ডাকতাম। অবচেতন ভাবে বিষয়টা রিপিট করাতে ওটাই ক্যাচ ওয়ার্ড হয়ে গেছিল, আমার বেলায়। একটা ছাত্রকে খুব পিটিয়েছিলাম এইজন্যই। পরে প্রচণ্ড অনুতাপ হয়েছিল। ওই ছাত্রটাই এখন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটেটিভ এর কাজ করে। একবার বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ওর সাথে দেখা হয়েছিল, কি শান্ত, ভদ্র।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে জোরে গাড়ি ছুটতে লাগল। গাড়িতে দু'জনেই বেশ চুপচাপ। এই দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে কত কিছুই না দেখলেন। বদ্রীনাথ দা ক্লাসে ভুগোল পড়াতে পড়াতে বার বার 'হচ্ছে গিয়ে' বলেন বলে ছেলেমেয়েরা আজও ওনাকে আড়ালে 'হচ্ছে গিয়ে' বলে ডাকে। আর এখন তো বেতের শাসন উঠে গেছে, যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বন্ধু হতে পেরেছেন তাঁরাই টিকে গেছেন। যশোর রোডে ঢোকার মুখে বাদশা বলে উঠল, স্যার, সংস্কৃতর সেই টাক মাথা রমেশ চন্দ্রবাবুকে কলকাতার শান্তিনীড় বৃদ্ধাশ্রমে দেখতে পেলাম। উদ্দোলক ওখানে সোশ্যাল ওয়ার্কে গেছিল। ওনাকে কত 'বাঁকা চাঁদ' বলে ডেকেছি। ভীষণ শান্ত ঐ মানুষটা কখনও রেগে জাননি। আমাদের সন্তান স্নেহেই দেখতেন। জানতামই না, উনি নিঃসন্তান। আজ শেষ ঠিকানা ''শান্তিনীড় বৃদ্ধাশ্রম'।

সব কাজ মিটিয়ে মেয়ের ফ্ল্যাট এ যখন নাতনি, তিতিসার সাথে গল্প করছিলেন, তখন তিতিসা বলে উঠল, দাদাই জানো, আমাদের স্কুলের রোগা ডিগডিগে পল্লবী ম্যামকে স্কুল বাসে দাদা দিদিরা র'চা বলে ডাকে। আর হাসে, জানো? একথা শুনে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ সুকুমারবাবু ভাবলেন, শুধু মুদ্রাদোষ কাটানোই নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধু হতে না পারলে শিক্ষক সমাজ বিপন্ন হতে বাধ্য।

গলায় গামছা লাগিয়ে একটা লোককে টেনে আনছে-গরু টানার মতো। তার আসার মোটেই ইচ্ছে নেই। রীতিমতো ছ্যাঁচনাচ্ছে। কিন্তু, পেছনে ভেঙে পড়েছে হাটের সমস্ত লোক।

হৈ হৈ শব্দ। যেন একটা বিজয় মিছিল।

সকাল দশটা। থানার পাশেই বাজার। এমনিতেই এই সময় বাজারের যথেষ্ট লোকজনের সমাগম হয়। তার উপরে আজ হাটবার। সকাল থেকেই দূর দূরান্ত থেকে মানুষ সব এসে হাজির হয়েছে-বেচাকেনা করতে।

ভদ্রকালী থানার এই হাট—বাজারটাই এলাকার লোকজনের কাছে যেমন সাপ্তাহিক কেনাবেচা এবং দ্যাখা স্বাক্ষাতের একটা সুযোগ, তেমনি থানার পুলিশ অফিসারদের কাছে একটা মাথাব্যাথার কারণ। অতীতে বেশকিছু খুন, রাহাজানি, এমনকি পাঁচশো মিটার দূরে ব্যাঙ্কেও ডাকাতির ঘটনা এই হাটবারেই ঘটেছে শুধুমাত্র সেই কারণেই থানার সব অফিসার এবং ফোর্স সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—যতক্ষণ না হাটের কেনাবেচা, মানুষের ভীড় শেষ হচ্ছে, হাটের দিন সব পালা করে ডিউটি করে। কখনো হাটের ভেতরে। কখনো নদীর পাড়ে, মদের ভাঁটিখানার পাশে। আবার কখনো রাস্তা ঘাটে, ব্যাঙ্ক-পোস্টঅফিসের কাছে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঘোরাফেরা করে।

শেখর মিত্র মাত্র কিছুদিন হল এই থানায় এসেছে। মেজবাবু। সবটা এখনো ওর নখ-দর্পণে হয়ে ওঠেনি। সেদিন ছিল হাটবার। বড়বাবু রুদ্রমানব মুখার্জী সকালেই জেলা সদর বেরিয়ে গেছেন। বড়সাহেবের মাসিক ক্রাইম কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য। ওকে চার্জ দিয়ে বলে গেছেন ঠিকমতো সামাল দেওয়ার যাবতীয় নির্দেশাবলী।

শেখর মিত্র নিজে হাটের ভেতরটা একটা রাউন্ড লাগিয়ে এসে সবে মন্টুর দোকানে বসেছে, চা খাবে আর খবরের কাগজটাতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেবে।

মন্টুর দোকানটা থানার একদম উল্টো দিকে রাস্তার পাশেই। সেখান থেকেই হাটের অনেকটা অংশের উপর নজর রাখা যায়। মদের দোকান, তাড়ির ভাঁটি, নদীর পাড় ইত্যাদি।

হৈ হৈ শব্দ শুনে শেখর মিত্র চোখ তুলে তাকায়। দ্যাখে, একটা লোককে গলায় গামছা লাগিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে জনা কয়েক লোক। ওদের পেছনেও অন্তত জনা চল্লিশ-পঞ্চাশেক হাটের লোকজন। এগোচ্ছে আর মহা আনন্দে চিৎকার করছে।

সর্বনাশ। নির্ঘাত লোকটা কোনোকিছু চুরি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে।

শেখর মিত্রের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। গণধোলাই না শুরু হয়ে যায়! এভাবেই নাকি মাস পাঁচেক আগে পাবলিক দুটো চোরকে সামান্য কুমড়ো চুরির অপরাধে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। মাসখানেক তার রেশ ছিল। চিলেতলা, চন্ডিপুর ইত্যাদির

লোকজন কাপাসডাঙা পেরিয়ে হাটেবাজারেই আসতে সাহস পেতনা। আসলে দোকানদারের বাড়ি ছিল চিলেতলা-চণ্ডিপুরে। আর চোর দুজনের বাড়ি কাপাসডাঙায়। শেষ পর্যন্ত নাকি মহকুমা শাসক এসে দু তরফের সাথে বসে ব্যাপারটার মিটমাট করেছিলেন।

এখনই ব্যাপারটা দেখা দরকার।

শেখর মিত্র কয়েক কদম এগোতেই দেখল যারা বীরদর্পে লোকটাকে টেনে আনছে তারা মূলত থানারই জমাদারবাবু পুণ্ডরীকাক্ষ সেন, আর হোমগার্ড হরিপদ এবং মন্টুবাবু। একদম পেছনে হাটের উৎসুখ আগুয়ান লোকজনের পেছনে মেজবাবু গোঁফেশ্বর।

জমাদারবাবুকে দেখে চেনার জো নেই। লুঙ্গি, গেঞ্জি, মাথায় একটা গামছার ফেট্টি। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। এক্কেবারে ছদ্মবেশে। ঠিক যেন সেই গল্পে পড়া আগেকারদিনের গোয়েন্দাদের মতো।

শেখর মিত্র রীতিমতো বিস্মিত। যে জমাদারবাবু পারতপক্ষে থানা থেকে মন্টুর চায়ের দোকানের বাইরে যায় না, ইনকোয়ারিগুলো বঙ্কিম হোমগার্ডকে দিয়ে দশ-বিশটা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে করিয়ে আনে, সে কিনা ছদ্মবেশে বেরিয়েছে আসামী ধরতে। তার সাথে সঙ্গত করতে থানার টেবিল ডিউটি ছেড়ে গিয়েছেন শ্রীমান গোঁফেশ্বর রায়। নির্ঘাত কোনো বড় দাগী কিংবা লাল-কালির ওয়ারেন্টের আসামী। ঠিক ঘেঁটেঘুঁটে, কিংবা সোর্স লাগিয়ে খবর সংগ্রহ করে ধরে ফেলেছেন। অথচ, বড়বাবু গত পরশুদিন ওঁকে ওয়ারেন্ট নন-একজিকিউশনের জন্য কি গালাগালই না করেছেন। '....বুড়ো হলে কি হবে, দেখিয়ে তো দিলো।'....

কেসটা একটু জানা দরকার।

আগ্রহভরে দোকান থেকে বেরুতেই শুনতে পেল, লোকটা কাতর কণ্ঠে বলে চলেছে— 'ছ্যাড়।... ভাল হইয়ে গ্যাছি বলো।.... মদ খাইনা.... জুয়া খেলিনা.... বৌরে পেটাইনা। বিশ্বাস করুন ছ্যাড়, আমি এখন বলো.... কারও পাতা কেটে খাই না। আজ হঠাৎ তাঁই রহিমটার পাল্লায় পড়ে একডুস মদ খেয়েছি।'....

পুণ্ডরীকাক্ষ বাবু ওসব শুনতে রাজি নন। গরু টানার মতো হিড়হিড় করে টানছেন আর সমানে বলে চলেছেন 'এই ব্যাটা? চোপ। না দেখে তোকে ধরা হয়েছে? এক্কোবারে পয়েন্টে পয়েন্টে মিলছে বলেই তোকে ধরা হয়েছে। ...বেশি চিল্লালে প্যাঁদানির চোটে তোর নাড়িভুঁড়ি বের করে দেবো।'...

হাটের ভেতর থেকে এভাবে রীতিমতো গোয়েন্দা কায়দায় আসামী ধরা, ভদ্রকালী থানার ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা। স্বভাবতই সবাই মজা দেখছে। উদগ্রীব হয়ে আছে ব্যাপারটা জানার জন্য।

কেউ আবার গোঁপেশ্বরের গুণকীর্তন করে বলে—'দারোগা হো তো এ্যাইসাই।'

সামনা সামনি হতেই গর্বভরে তাকিয়ে জমাদারবাবু মুচকি হেসে বললেন—'বুঝলেন মেজবাবু, শালোকে পেয়ে গেছি।....বাপরে। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। ...অর্ডার-শীটে হাকিমসাহেব একদম জর্জরিত করে তুলেছেন এইবারে।'...

শেখর মিত্রের ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করবে— কি কেসের আসামী? কিন্তু সেই ফুরসৎ আর পায়নি। তার আগেই সেনবাবু ওকে নিয়ে ব্যারাকে গিয়ে ঠেলে উঠলেন।

থানায় না গিয়ে জমাদারবাবু ওকে নিয়ে কেন ব্যারাকে গেলেন?

শেখর মিত্রের কেমন যেন একটা সন্দেহ হল। তাহলে কি ওর কাছ থেকে আরও কোনও গোপন খবর সংগ্রহ করবেন? গ্যাঙ-মেম্বারের নাম? আগ্নেয়-অস্ত্রের খোঁজ? ব্যাপারটা দ্যাখা দরকার।

মন্টু চায়ের দোকানদার হলে কি হবে, থানার মোটামুটি সব খবরেই সে রাখে। শেখর মিত্রের হাতে চায়ের গেলাসটা তুলে নিয়ে বলে—'জমাদার বাবু কিন্তু স্যার, পাক্কা খবর পেয়েছিলেন। ...বলেন স্যার? নাহলে হাটের এত লোকের ভেতর থেকে রাইট আসামীকে ধরা কিন্তু চারটিখানি কথা নয়।'

-'তা ঠিক।' চায়ের গেলাসে চুমুক মেরে শেখর মিত্র বলে—'বুঝলে মন্টু, সবটাই বড়বাবু রুদ্র মানব মুখার্জীর গুঁতোয়। চাকরিটা অত সোজা নয়।'...

-'তাই হবে স্যার'। মন্টু পুনরায় খদ্দেরদের জন্যে চা তৈরি করতে করতে বলে—'দুদিন ধরে তাই জমাদারবাবুকে দেখছি কেমন উদ্ভ্রান্তের মতো চলাফেরা করছেন। যে লোকটা প্রায় সারাদিন আমার দোকানে এসে বসে থাকতেন চা খেতেন, খবরের কাগজ পড়তেন, আড্ডা মারতেন— সব বন্ধ করে ওই বিরাট গোঁফ ওয়ালা সঙ্গে নিয়ে শুধু বাজারে, ঘাটের পাড়ে এবং দেশি মদের দোকানের চারপাশে ঘোরাফেরা করছেন। যাক বাবা। শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন, বলেন স্যার?'...

-'ঠিক।' শেখর মিত্রের মন তখন থানার ব্যারাকে। পুণ্ডরীকাক্ষবাবু সেখানে আসামীটাকে নিয়ে কি করছেন তা জানার জন্য। একটা অব্যক্ত উন্মাদনায় এগিয়ে যায় থানার ব্যারাকের দিকে।

-'তোকে যা বলছি, তাই কর।' সেনবাবুর বাজখাঁই গলার আওয়াজ সেই সঙ্গে লোহার খাটের উপরে সজোরে লাঠির আঘাত করার শব্দ ছিটকে বেরিয়ে আসছে ব্যারাকের ভিতর থেকে।

শেখর মিত্র দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দ্যাখে, লোকটা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। সেনবাবুর হুঙ্কার আর হরিপদ হোমগার্ডের লোকটার মুখের সামনে লাঠি নাড়ানোর ভয়ে, - পেচ্ছাপ করার উপক্রম। কিন্তু একদম স্পিকটি নট।

-'কি হল?' গোঁফেশ্বর দারোগা ওর হাতের লাঠিটা দিয়ে লোকটার পেটে একটা

গুঁতো দিয়ে বলেন—'বলছি না লুঙ্গিটা খুলতে। খো-ও-ও-ল। নাহলে কিন্তু, আমি আর মোটেই দেরি করব না। জোর করে টেনে খুলে দেব।'...

সেকি!... এসব কি বলছে?

লুঙ্গি টেনে খুলে দেবার কথা শুনে শেখর মিত্র চমকে ওঠে। লোকটাকে উলঙ্গ হতে বলছে। এ কোন ধরনের ইন্টেরোগেশন? বর্তমান যুগের পুলিশ-এই ধরনের আচরণ।

খুব খারাপ লাগে ওর। গম্ভীরভাবে বলে— 'এ কি করছেন আপনারা? লোকটাকে উলঙ্গ হতে বলছেন। জানেন না, এটা অমানবিকতা, বেআইনি। বড়বাবু এসে যদি ব্যাপারটা শোনেন'...

-'রাখেন তো স্যার।' পুণ্ডরীকাক্ষবাবু একরকম বিরক্তির স্বরে বলে ওঠেন— 'আমি মরছি আমার জ্বালায়, আর আপনি এসেছেন মানবিকতা ফলাতে। অনেক কসরতে খুঁজে পেয়েছি এই কালো-লাল আর সবুজ চেকের লুঙ্গিটা। বিশ-বাইশ বছর আগেকার মামলার সীজ করা আলামত। মালখানায় রাখা ছিল, পাচ্ছিনা।... মরার পুটলি-কাপড়-চোপড় বাঁধার গাছটাতেও খুঁজেছি, পাইনি। হাকিম তলব করছেন বারবার। কিন্তু পাঠাতে পারছি না। একদম চাকরি যাওয়ার কল। ...এই বয়সে উইদাউট অন্যায় যদি চাকরিটা চলে যায়, তখন আপনি আমার বৌ-বাচ্চাদের'....

বৃদ্ধ জমাদারবাবু কথা শেষ করতে পারলেন না। হাঁউ-মাউ করে প্রায় কেঁদে উঠলেন।

শেখর মিত্র রীতিমতো অপ্রস্তুত। কোনও কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল-সত্যিই লোকটা একটা কালো-লাল-সবুজ রঙের চেক লুঙ্গি পরে রয়েছে। কিন্তু, বুঝতে পারছেন না। কেন তাকে গরু টানার মতো টানতে টানতে ধরে আনা হয়েছে?

-'এই মিত্তিরবাবু' - শ্রীমান গোঁফেশ্বর ব্যাপারটা অনুধাবন করে তার রানা প্রতাপ মার্কা কালো মোটা গোঁফটার প্রান্তদেশ দুটোর মোচড় দিতে দিতে বলেন—'মোদ্দা কতা জমাদারবাবুর প্রয়োজন ওই চেক লুঙ্গিটা, লোকটা নয়।... দেখছেন না ওই লুঙ্গিটার কথা ভেবেই বেচারার চোখে-মুখে কি ভয়ঙ্কর আনন্দধারা বয়ে চলেছে।'...

অদ্ভুত ব্যাপার।

সেনবাবুর কাণ্ড দেখে শেখর মিত্রের হাসি পাচ্ছিল। সেই সঙ্গে খারাপও লাগছিল লোকটার করুন অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বলে—'আপনার লুঙ্গি দরকার তাই বলে ওকে উলঙ্গ করে? এটা কেমন ব্যাপার? ...দেখতেই তো পাচ্ছেন লোকটাকে। ওর পরনের লুঙ্গিটা যদি আপনি কেড়ে নিয়ে নেন, তাহলে ওকে হয়তো বাকি দিনগুলো উলঙ্গ হয়ে, কিংবা আন্ডারওয়্যার পরেই কাটাতে হবে। নতুন লুঙ্গি কেনার ক্ষমতাই ওর নেই।...

'কি যে বলেন স্যার। আমি কি এতই বোকা যে ওকে উলঙ্গ করে লুঙ্গিটা কেড়ে নিয়ে

ছেড়ে দেবে? কাগজওয়ালা আর টিভিওয়ালাদের সুযোগ দেব এগেইনস্টে লেখার?' বলে প্যাকেট থেকে একটা নতুন লুঙ্গি বের করে দ্যাখায়।

শেখর মিত্র একেবারে নিশ্চুপ।

সেনবাবু ওর পান খাওয়া কালো দাঁতের ফাঁকে হাসি তুলে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলেন—'কিরে ব্যাটা? এই লুঙ্গিটা পেলে তোরটা দিবি তো?... দ্যাখ, আর বেশি ব্যাগড়বাই না করে চট করে দিয়ে দে। ...আমার আরও কাজ আছে।'

লোকটা আর কোনও কথা না বলে জমাদার বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পরনের লুঙ্গিটা খুলে নতুনটা পরে, একটা নমস্কার করে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যায়। জমাদার বাবু লুঙ্গিটাকে একটা কঞ্চির আগায় লাগিয়ে থানার টেবিলে রেখে নাচতে নাচতে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেন। তবলা বাজানোর ভঙ্গিতে টেবিলে টোকা মারতে মারতে হেসে বলেন— 'এই হরিপদ? এদিকে আয়।... ভোঁদলা কসাইয়ের কাছে এই লুঙ্গিটা নিয়ে গিয়ে এটাকে একটু রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আয়।... শালার ইঁদুর!... ভেবেছিল জোগাড় করতে পারবে না।... থানার বাবুরা যে জাদুকর, এটা অনেকেই জানেনা।'...

-এই বুদ্ধিটা আপনাকে কে দিয়েছে?

মেজবাবুর প্রশ্নের উত্তরে জমাদারবাবু গোঁফেশ্বর দারোগাকে দেখিয়ে বলেন—উনি। এটা ওরই জাদু।

বশীকরণ ■ তরুণার্ক লাহা

-অমিতদা আমি বেশ ফাঁপরে পড়েছি।

-ফাঁপর, সেটা কি জিনিস?

-আরে শোনোই না, কলেজের একটা মেয়েকে অফার করছি, তবু কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না।

-লক্ষণ ভালো নয় দেখছি। তা ভাই যে পাত্তা দেয় না তার পিছনে ছোটো কেন?

-মানুষের যা স্বভাব। মেয়েটাকে দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। অপূর্ব।

-না ভাই আমাকে আর মেয়ে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে লাভ নেই। আমি এখন কলিযুগের গান্ধারী (পুং)। তোর বউদি ছাড়া কাউকে দেখি না। তা মেয়েটার নাম কী?

-পূর্বা না কি যেন। আমি বনলতা নাম দিয়েছি।

-বেশ কাব্যিক নাম। তো ভাই ওই বনলতা বিচুটি নয় তো?

-কি যে বলো। তবে তেজ বিচুটির মতোই। চোখ তুলে চাইলেই বুকটা শুকিয়ে যায়।

-যাক তোর মধ্যে পুরুষ মানুষের লক্ষণ ৯০ শতাংশ জীবিত। এ বিষয়ে আমার কি করার আছে?

-কিছু না। শুধু একটা পথ বাৎলে দাও। বনলতার হৃদয় যেন জয় করতে পারি।

-বোকা। মেয়েদের মন জয় করা যায় না। এতদিন পরেও তোর বৌদি আমার প্রতি হৃদয়হীন রয়ে গেল। পতি হিসাবে আমি এর কোনো প্রতিকার করতে পারিনি।

-কোনো পথ নেই? আমার পড়াশুনা তো লাটে উঠেছে। পড়তে বসলেই বনলতার চাঁদবদন চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছে।

-এ বয়সে একটু আধটু এরকম হয়। রোগটার নাম লাভেরিয়া। ম্যালেরিয়ার সমগোত্রিয়। তবে হতাশ হওয়ার কারণ দেখছি না। পথ ঠিক বেরিয়ে যাবে।

-ধরো, যদি কোনো জ্যোতিষির শরণাপন্ন হওয়া যায়...। খবরের কাগজ খুললেই তো দেখি জ্যোতিষ সম্রাট অমুক। ব্যর্থ প্রেম দাম্পত্য কহল, বশীকরণ-সকল সমাধান মাত্র সাতদিনে। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

-ও সব বিশ্বাস করিস? তোর বৌদি বলে-আমার স্বভাবটা নাকি বড্ড খারাপ ছিল। কোনো এক তান্ত্রিকের কাছে বশীকরণ তেল এনে বশ করেছে। এও সম্ভব?

-তাহলে উপায়? বনলতা কি মায়াবী হরিণীর মতো অধরাই রয়ে যাবে?

-এতো ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তোর কথা মতো একবার চেষ্টা করে দেখলেই হলো।

-যাক বাবা বাঁচা গেল।

নরেশ, আমার কলিগতুতো ভাই। কলেজে লাষ্ট ইয়ারের ছাত্র। তাই বোধহয় মেয়েদের প্রতি দিন দিন লাষ্ট বেড়ে চলেছে। সুদর্শন পুরুষ। বখে যাওয়ার জন্য বাপের অঢেল সম্পত্তির অধিকারী। কুছ পরোয়া নেই ভাব। প্রেমের দিশা খুঁজতে এসেছে এই প্রেম পূজারীর কাছে। রতনে রতন চেনে।

রবিবারের ঝলমলে সকাল। জ্যোতিষ নিয়ে চা-এর কাপে ঝড় তুলেছি আমি ও সুস্মিতা। আমি নাস্তিক সুস্মিতা জানে। তবু আমার সামনে গলা ফুলিয়ে বলে—তুমি বিশ্বাস করো আর না করো জ্যোতিষ মানুষের জীবনের দর্পন। কত দিশাহীন মানুষের পথ খুঁজে দেয় এই জ্যোতিষ। তোমাকে তো বলেছিলাম আমার হস্তরেখা বিচার করে এক তান্ত্রিক বলেছিলেন, আমার নাকি প্রেম করে বিয়ে হবে। হলো তো তাই।

এই অমিত সিংহও কেশর ফুলিয়ে বলে বড্ড ফালতু কথা আমি বিশ্বাস করিনা। জ্যোতিষ না বললেও তোমার প্রেম করে বিয়ে হতো। এ বিষয়ে চন্দ্র সূর্যের কোনো হাত নেই। বরং বলতে পারো আমাদের চারহাত এক করতে রমেনের বেশ হাত ছিল। রমেন না থাকলে বোধহয় তোমার বাবা আমার বাবার সাথে হাতাহাতি লেগে যেত। আর তুমিও আমার বেহাত হয়ে যেত।

-তোমাদের মতো নাস্তিকের জন্য দেশের এই হাল।

হঠাৎ সদর দরজায় আমার চোখ আটকায়। সাতসকালেই নরেশ আমার বাড়িতে। হাসি খুশীভাব। মুখে পাতলা হাসির পলেস্তরা। সাত পাঁচ না ভেবেই জানতে চাই বড্ড সাত সকালেই ঝলমলে রোদের মতো আমার ডেরায়? ব্যাপারখানা কি? হাত বাড়িয়ে আনন্দের সাথে আনন্দবাজার তুলে নরেশ বলল আনন্দ সংবাদ, দাদা। আমাদের বাঁকুড়াতে এক জ্যোতিষ আচার্যের আস্তানা রয়েছে। এই দেখ কাগজে বিজ্ঞাপন। রাসতলা থেকে ডানদিকের গলিতে শিবমন্দিরের পাশে। চলো অমিতদা একবার হানা দিই।

-আমার যেতে মানা নেই। তবে বিশ্বাস হচ্ছে তোর?

-না আঁচালে বিশ্বাস নেই। দেখতে তো কোনো ক্ষতি নেই।

-ঠিক আছে চল।

সুস্মিতা টিপ্পনি কাটে বেকায়দায় পড়লে বাঘও হাম্বা ডাকে।

রাসতলায় এসে অনেক ঘোরাঘুরির পর জ্যোতিষ কার্যালয় খুঁজে পাই। বহু পুরাতন একতলা বাড়ি। রং উঠে লোম ওঠা রাস্তার কুকুরের মতো অবস্থা। চৌকাঠের উপর ছোট্ট সাইনবোর্ড। আনাড়ি হাতের লেখা। রঙের জৌলুস নেই। জুতো খুলে কার্যালয়ে ঢুকলাম। জানলা বোধহয় ঘুলঘুলির পাশে একটা। তাতে আলো ঢুকতে লজ্জা করছে। একটা চৌকির উপর একজনকে দেখলাম। চমকে উঠি। ডমরুধর নাকি? এমন খ্যাংড়াকাটি চেহারা খুব একটা চোখে পড়ে না। নাকের ডগায় পুরুলেন্সের চশমা। মনোযোগ দিয়ে কারো হলুদ কুষ্ঠিতে মনোযোগ। শুরুটা আমিই করলাম আজ্ঞে, এটা কি জ্যোতিষ আচার্য বিদ্যাধরের কার্যালয়? ঘাড় তুলে তাকায় বিদ্যাধর (ডমরুধর)। কুতকুতে চোখ দিয়ে জরিপ করছে আমাদের। ইশারায় নড়বড়ে এক বেঞ্চের উপর বসতে বলল আমাদের। গলা পরিস্কার করে জানাল কোনো ভুল নেই। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। এবারে বলুন গিন্নির সাথে কতদিন ঝগড়া চলছে? গিন্নিকে নিজের বশে আনতে চান তো? কোনো চিন্তা করবেন না। একডোজেই গিন্নির মুখে তালা। তারপর দেখবেন সুড়সুড় করে আপনার পিছন পিছন ঘুরছে।

মুচকি হেসে বলি এখন ডোজটাই ভুল দিয়ে ফেলেছেন। সমস্যাটা আমার নয়। আমার এই কলিগতুতো ভাই-এর। প্রেমরোগে ধরাশায়ী প্রায়।

মোটা আঁতস কাঁচটা নিয়ে নরেশকে বলল দেখি বাবা ডানহাতটা।

নরেশ বাধ্য ছেলের মতো হাত বাড়ায়। আঁতস কাঁচের উপর বিদ্যাধরের ঘোলাটে চোখ কি যেন আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে। কিছুক্ষণ পর মুখে চওড়া হাসি। আরে বাবা! শোকেস ফাঁকা! মাড়িতে একটা দাঁতও ঝুলে নেই।

শক্ত মাড়িতে কথা চিবিয়ে বিদ্যাধর বলল লক্ষণ শুভ। প্রেমঘটিত বিবাহ। অতি শীঘ্র।

নরেশের গলায় হতাশার রেশ আরে মশাই বিয়েটা হবে কার সাথে? মেয়েটা তো পাত্তাই দিচ্ছে না।

নরেশের হতাশায় সান্তনার মলম লাগিয়ে বিদ্যাডমরুধর সরেস মন্তব্য করে, বিচলিত কেন বাবা। প্রেমে চাই রাবনের ধৈর্য। তবে আমার কাছে যখন এসে পড়েছ প্রেম পাকিয়েই ছাড়ব। আমার মন্ত্রপূত তেল অব্যর্থ। শর্ত একটাই বিফলে মূল্য ফেরত।

নরেশকে ভরসা দিই আচার্য যখন কথা দিচ্ছেন ঘাবড়াস না।

নগদ একশো টাকা দক্ষিণা। একটি ছোট্ট শিশিতে মন্ত্রপূত তেল পেলাম। ফোকলা মুখে হাসি ছড়িয়ে আচার্য তেলের সাথে কিছু টিপস ফ্রীতে দিল ট্রমা। ভৈরবীর নাম জপ করবে একশোবার। রাতের বেলায়।

সন্ধ্যাপ্রদীপের তেল-এর সাথে এক ফোঁটা মেশাবে। তারপর প্রণয়িনীর শরীরে যে কোনো জায়গা তেল ঠেকিয়ে দাও। তারপর দেখবে তেলের কেরামতি। সাতদিনের মাথায় তোমার প্রেয়সী তোমার বাহুলগ্না। দিনদশ পর খবর দিও। আর দক্ষিণা লাগবে না। বেশ কদিন নরেশের পাত্তা নেই। একদিন হঠাৎ বাজারে দেখা। নরম সুরেই বলি একি ভায়া সিংহের গুহায় যাও না আর? ডমরুধরের তেলের কার্যকারিতা কেমন? পাখি ফাঁদে পড়ল?

নরেশের মুখে ল্যাজুক হাসি। প্রেমে পড়লে বাতাসার মতো মিষ্টি সাদা হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁ হাতে চুলে বিলি কেটে নায়কোচিত ভঙ্গীতে বলল একশো টাকায় একশো শতাংশ কাজ। বুড়োর কেরামতি আছে বলতে হবে। বনলতা এখন আমার প্রেমে ডুবন্ত টাইটানিক।

—দক্ষিণটা তাহলে ফালতু যায়নি বল? মাভৈ। চরৈবেতি। তবে সাবধানে। পথ বড় পিছল। পা হড়কালেই গেলি। এই গুরুবচন মনে রাখিস। চলি রে। সময় পেলে যাস।

কথা শেষ হওয়ার আগেই নরেশ হাওয়া।

একমাস পর আমার কলিগ পরেশ আমাকে আড়ালে ডেকে বলল অমিত, বেশ ফাঁপরে পড়েছি।

চমকে উঠি। গুষ্টি শুদ্ধ কি এরা ফাঁপরেই পড়ে? হাল্কা গলায় বলি ফাঁপরটা কি তোদের সদর দরজার সামনেই?

পরেশ হাসে, আরে না ভাই, এই ব্যাপারটা পুরোপুরি ডোমেস্টিক প্রবলেম। আমার গুণধর ভাই একটা মেয়েকে নিয়ে ভেগেছে। ঘরের লোক খুব চিন্তায়।

নিজেকে সামলে নিই। এ যে ভবিতব্য। মনে মনে বাহবা দিই নরেশকে। যাক, এতদিন পর ব্যাটাছেলের মতো কাজ করেছে বাছাধন।

না জানার ভান করে বলি মেয়েটা কে ভাই? স্বকুগোত্রীয়?

—কে জানে, ওদের কলেজেই পড়ত।

—সুন্দরী তো?

—আমি কি দেখেছি নাকি? তবে নরেশের রুচি তো জানিস।

—ঘরে আনলে তোরা মেনে নিবি?

—না মানার কি আছে? আমরা কোনো ঋণাত্মক চিন্তাভাবনা করি না।

সন্ধ্যেয় নরেশ আমাকে ফোন করে, অমিতদা, গুড ইভিনিং। সুসংবাদটা দিই। রেজিস্ট্রি বিয়েটা সেরে ফেলেছি। এবার বলো ওধারের ক্লাইমেট কি রকম?

—নো প্রোবলেম। চলে আসতে পারিস। আমার এখানে আগে উঠবি। বৌমাকে আর্শীবাদ করতে হবে না?

—ঠিক আছে কাল সকালেই যাচ্ছি।

পরদিন সকালে নরেশ ও তার নববধূ আমার ডেরায় হাজির। বাঃ নরেশের পছন্দজ্ঞান আছে। তাক লাগানো চেহারাই বটে। মুনী ঋষিদেরও ধ্যান ভেঙ্গে যাবে এই চেহারা দেখে।

সুস্মিতা নতুন বৌকে বেশ আদর যত্ন করল। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বুঝতে পারছি নরেশদের বাড়িতেও কোনো অসুবিধা হবে না।

নরেশ হঠাৎ বলে বসল অমিতদা, চলো শ্বশুরের আশীর্বাদ নিয়ে আসি।

অবাক হয়ে বলি আশীর্বাদ তো তুই নিবি আমি কি করব?

—আরে দাদা তুমি সঙ্গে থাকলে মনে বেশ জোর পাই। শ্বশুর মশাই কেমন আচরণ করবে কে জানে। মেয়ে ভাগানোর কেস যে। তুমি ছাড়া এ ফাঁপর থেকে কে উদ্ধার করবে?

—আবার ফাঁপর?

নতুন বৌ মিষ্টি হেসে বলল, চলুন না দাদা আমাদের সাথে। বাবা যা খটমেজাজি।

অগত্যা নবদম্পতিকে অনুসরণ করলাম।

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করি বৌমা তোমার বাপের বাড়িটি কোথায়?

—এই তো সামনের গলিতে।

নরেশ আমাকে ঠেলা মারে কোথায় যাচ্ছি বলো তো?

—তোর শ্বশুর বাড়ি।

বনলতা বলল এই তো এসে গেছি।

পা আর চলছে না। বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত। ঠিক দেখছি তো? চোখ কচলে নিই। বিশ্বাস হচ্ছে না। নরেশের মুখও বিস্ময়ে শামুক। চোখ ছানাবড়া।

চেয়ারে পা ছড়িয়ে নরেশের শ্বশুর। মেয়ে দেখে সোজা হয়ে বসল ভদ্রলোক। বনলতা পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল বাবা, এ তোমার জামাই।

তোবড়ানো গাল ঠেলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল নরেশের শ্বশুরের মুখে। গলায় সন্তুষ্টির

সুর, এসো বাবা এসো। দেখলে তো বাবা আমার মন্ত্রপূত তেলের কেরামতি। তবে অবাক হচ্ছি আমার দেওয়া বশীকরণ তেল দিয়ে শেষে কিনা আমার মেয়েকেই ভাগালে। আমার আপত্তি নেই। খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি তুমি ভালো ঘরের ছেলে। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও।

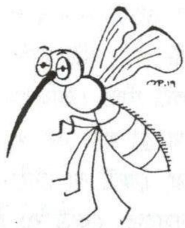
যাঃ বাবা, শাঁসালো জামাই পেয়ে ব্যাটা সব ভুলে গেল? আমি বিদ্যাডমরুধরকে বললাম এতদিন পর আপনার জ্যোতিষ চর্চা সার্থক। তাই না? অবাক হয়ে দেখলাম শক্ত মাড়ির কষ বেয়ে সন্তুষ্টির হাসি টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে জ্যোতিষ আচার্যের মুখ থেকে।

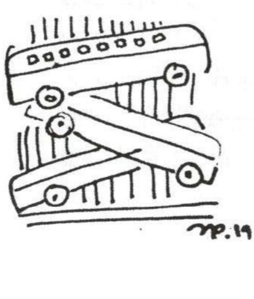
ছ ড়া র মা লা

মশা গণনা ■ হাসানআল আব্দুল্লাহ

দুই পাশে দুই গাধা আছে
বলতে কি আর বাধা আছে
এডিস মশার ধাঁধা আছে;
ডেঙ্গু করেছে তাড়া।
মশার ওষুধ কিনতে করেন
বিশেযজ্ঞ ভাড়া

মরছে মানুষ ঘাটে পথে;
হাসপাতালে শ'তে শ'তে
ভর্তি হয়ে হাহাকারে
করছে জড়ো পাড়া;
কিছু কিছু হাসপাতালও
যমের মতো খাড়া
হয়ে নিচ্ছে কেড়ে সব,
সে সব নিয়ে ফেসবুকেও
হচ্ছে কলরব!
উল্লোসিত মন্ত্রী এবার
ঝাড়ু নিয়ে আসে,
কাণ্ড দেখে এডিস মশার
বাচ্চারাও হাসে।





তিন টুকরো ছড়া ■ প্রবীর বিকাশ সরকার

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন
মুরগি একটা পাখী
হীরক ভেবে কাচের কণা
ট্রাঙ্কে তুলে রাখি।

ভোটের আগে লাফালাফি
ভোটের পরে চুপ,
হারুক জিতুক জ্বালতে হবে
ধর্মবাদের ধূপ।

পাপ করি আর পূণ্য করি
টাকাই ভগবান,
টাকার প্রশ্নে স্বর্গ-নরক
সব কিছু সমান।

হাসির সাতকাহন ■ মনীষা দে

সম্পাদকের ফোনটি পেয়ে চমকে ওঠে পিলে
"আজ্ঞে, বলি কেমন আছেন?" কিছুটা ঢোক গিলে
দাদা রেগে বলেন, "তোমার কেমনতর ধারা
কবিতা কেন দাওনা জমা কোনো ধাক্কা ছাড়া?
এবার চাই মজার লেখা—বিষয় হলো হাসি,
না লিখলে শাস্তি দেবো—পাঁচটি দিনের ফাঁসি।"

ফোনটা ছেড়ে টনক নড়ে হাসতে হাসতে ভাবি
হাসির কত রকমফের, হাসির কত ছবি।
দরাজ দিলে অট্টহাসি, হিসেবী হাসেন চেপে,
কারোর আবার হাসির ঠ্যালায় শরীর ওঠে কেঁপে,
কারোর হাসি চোখে মুখে ওটাই ওনার ধাত
কেউ বা হাসেন ঠোঁটটি টিপে, কেউ মুখে চাপা হাত।
দাঁত দেখিয়ে হাসে বা কেউ দাঁত কেলিয়ে হাসে
নারী দেখলে হাসি লুকোয় স্ত্রী যদি রয় পাশে।
কেউ বা হাসে ধাক্কা মেরে, কেউ বা নেচে নেচে
কেউ বা কাঁদে হাসতে হাসতে, কেউ বা হাসে হেঁচে,
হাসতে গিয়ে কখনও কেউ মেঝের গড়াগড়ি—
গম্ভীর মুখো হঠাৎ হেসে লজ্জায় বলে "সরি",
কখনও বাড়ির ভাই-বোনেরা বাড়ি ফাটিয়ে হাসে
রামগরুড়ের ছানারা বেজার থাকলে আশে-পাশে।
হা-হা হি-হি হে-হে হো-হো নিজের মত করে
নতুন প্রেমে হঠাৎ হাসি শূন্য ফাঁকা ঘরে।
বাচ্চাদের হাসতে দেখলে আমিও হাসি খুব
ওদের সাথে শৈশবের ঐ স্মৃতির জলে ডুব।
কেউ বা হাসে খুকখুকিয়ে হুপিং কাশি কেশে
ভালো লাগে আমার কথায় দুঃখী যখন হাসে।

মনের চোখে দেখতে যে পাই মায়ের মুখের হাসি
সেই হাসিটাই আমি বোধ হয় সবচেয়ে ভালোবাসি।

হুলস্থূল ■ কৃষ্ণাঙ্গ কাশ্যপ

কুশলী

মূল কথা 'সেন্টিমেন্ট', ওটি আগে খপ্ ক'রে
ধরে ফেলা চাই—
পাবলিকের সমর্থন, হুঁ হুঁ, বাবা, ঝপাঝপ
টেনে নিই,
যতখানি পাই!

প্রতিনিধি

যাদের ভোটে জিতলে তুমি,
দাও তাদেরই ধাপ্পা!
জল্‌দি-জল্‌দি ক্ষমতা দখল—
সঙ্গে সঙ্গে 'ভোল'টি বদল!
জানো না কেন ভোটদাতারা
তোমার ওপর খাপ্পা?



গণখেলা

যাকে ইচ্ছে দাঁড় করার
গণতন্ত্রের খেলায়!
নেতা যে মুই, আমার নামেই
জিতবে ও যে হেলায়!!

কারচুপি

এক তোলাবাজ প্রাসাদচূড়ায়, অন্যটি ওই দেউড়িতে;
দু'জনে রোজ তরজা চালায়, কি গরমে, কি শীতে!
এ বলে ওকে, বুক ফুলিয়ে, 'তোর চেয়ে ঢের সৎ আমি!'
—কতটা সত্যি, জানে তা সবাই, আর জানেন অন্তর্যামী।
আতঙ্কিত বাসিন্দারা সমস্ত দিন ভাবেন তাঁরা
কে যে কখন বাধায় দাঙ্গা!— কে জেতে কারচুপিতে...
কি গরমে, কি শীতে!

রাজ আর নীতি

যে যখন 'রাজ' করে,
তার পথটাই 'নীতি'—
তার 'নীতি'টাই নীতি!
রাজ-নীতি! রাজনীতি!!

চুনি-পান্না

মগ্ন হয়ে যা পান কবি,
অন্য কেউ তা পান না—
ঝলসে ওঠে কার কবিতায়
হিরে বা চুনি, পান্না?

ফুসকুরি ■ শূলপানি শর্মা

(১)
বেলা অবেলা কালবেলা
লিখেছেন জীবনানন্দ
এবেলা ওবেলা সারাবেলা
হাঁকছেন বাজারানন্দ

(২)
সেতুভঙ্গের
হেতু কী
মেট্রোরেলের
ঠোকাঠুকি!

(৩)
আনাদরে আনা যায়
কত আনারস
মোমো খাওয়া মোমো খেলা
এক নয় বস্।

(৪)
ছোটোবেলায়
শতকীয়া
বড়বেলায়
পরকীয়া!

(৫)
চারদিকে
শুভেচ্ছা
দিকে দিকে
সু-কেচ্ছা!

(৬)
কে করেছে
'হ্যাল'-এর হাল
আবার কে
ওই রাফাল!

(৭)
জানার শুধু
এই
সিটু'-তে কে
নেই!

(৮)
ভালবাসা মোরে
ভিখিরি করেছে
তোমারে করেছে রানি'
ফেসবুক মোরে
করিয়াছে কবি
খিচুড়ি ও বিরিয়ানি!

(৯)
কেউ পাহারাদার
কেউ বা চৌকিদার
শুনে যাই কতবার
তাই দাও নাকে তেল
ঘুমিয়ে দ্যাখো খেল
খোলা থাক্ সব দ্বার।



আজব কাণ্ড ■ সুপ্রভাত মণ্ডল

ঐ ছুটে যাচ্ছে
ধরে আন ব্যাটাকে;
আমাদের বাগানের
ফুল ফোটা দেখে সে।

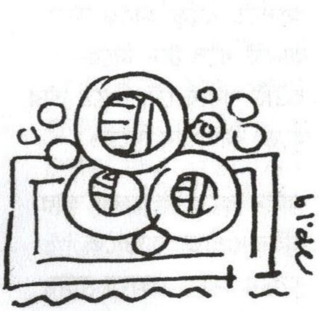
যদি দেখে শুধু তাকে
ক্ষমা করে দেওয়া যায়,
গন্ধ শুঁকেছে নাকে
নাক কেটে দেওয়া চাই।

গোলাপের সৌরভ,
রজনীর সুবাসে
ভরে থাক চারিদিক
তোর কিবা যায় আসে?

এতো তোর স্পর্ধা
দু-মিনিট দাঁড়িয়ে
চোখে দেখে নাকে শোঁকে,
ঘেঁটি ধরে নাড়িয়ে—

গন্ধটা বার কর
যেনো তেনো উপায়ে
না পারিলে তোদেরকে
দেব জেলে ঢুকিয়ে।।





কাটমানি ■ অলোক শ্রীমানী

ঢাকনা দিয়ে খেতে খেতে
ঢাকনা কখন গেছে খুলে,
সেই সুযোগে জেহাদের দল
মাগনা পেয়ে আছে ভুলে।

যোশেফ পিটার রাম রহিমের
ঠাণ্ডা ঘরে গল্প ফাঁদি,
আম জনতা লোক ঠকিয়ে
লোক দেখানো কুমির কাঁদি।

রাজাও করে প্রজাও করে
কারো কখনও হয়নি দোষ,
রাজার কথায় জাল ফেলতেই
বিস্ফোরণে 'জনরোষ'।

রাজার দোষে সবাই দোষী
হবে কি বলো, তার বিচার?
হবে কি! এবার সবার ফাঁসি,
সব প্রজাদেরও নির্বিচাব!

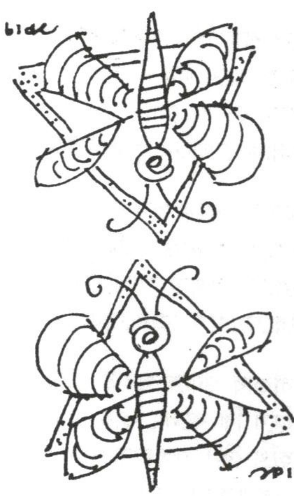
হাগ ডে ■ অতীশচন্দ্র ভাওয়াল

সকাল সকাল একজনকে
দিতে গেলাম হাগ,
দাঁত খিঁচিয়ে বলল সে
যা, ভাগ....ভাগ....।

তাড়া খেয়ে যেই ছুটেছি
পড়লাম নিচে গড়িয়ে
চোখ মেলে দেখি, পড়ে আছি
পাশবালিশ জড়িয়ে।

এমনি করেই আমার আজ
হাগ ডে শুরু সকালে,
সারাদিন তো পড়েই আছে
জানি না, কী কপালে।

(১২ই ফেব্রুয়ারি-
ওয়ার্ল্ড হাগ-ডে — আলিঙ্গন দিবস)



পরকীয়া ছড়া ■ শংকর দেবনাথ

কোর্টে নাকি রায় দিয়েছে
পরকীয়া বৈধ রে—
নয় চুরি আর তুড়ি মেরেই
এখন খাবো কই ধরে।

ভেবেই ভোলা ছোলা খেয়ে
বেরিয়ে পড়ে উল্লাসে—
পাশের বাড়ির দাসের বউয়ের
খাবেই রসগুল্লা সে।

অনেকদিনের ইচ্ছে মনের
পূর্ণ হবে এবার তো,
আইন হাতে নেই সাহস আর
কারোর বাধা দেবার তো।

দাসের ঘরে ঢুকেই ভোলা
যেই ধরেছে হাত তারই
অমনি ঝাঁটা সপাং সপাং।
লেজ গুটিয়ে পাততাড়ি।

আসতে বাড়ি আস্তে করে
কানটি ধরে টান দিয়ে—
বউটি ঝরায় মৌ পিঠে তার
মুড়ো ঝাঁটাখান দিয়ে।

আইন করে কি হলো আর
মাইন পোঁতা রাস্তাতে
দু'কান মেলে ভোলা বলে,
আর যাবো না কাজটাতে।

নতুন খেলা খেলব এসো ■ অসীম দাস

নতুন খেলা খেলব এসো দু'জন সাথে সাথ
সাজব আমি সেই শ্রীকান্ত তুমি ইন্দ্রনাথ।

প্রথম দেখা সেই যে রাতে আজও মনে পড়ে
সেজের বাতি জ্বালিয়ে আমরা পড়ছি তখন ঘরে।

থুতু ফেলার টিকিট হাতে সেজদা চেঁচায় কে রে?
মেজদা হঠাৎ চিৎপটাং হাতের আঙ্গুল নেড়ে!

সবাই যখন কুঁকড়ে ভয়ে পিসেমশাই চেঁচায়
পিসিমা তো দোতলাতে উঠলো রেগে বেজায়।

রামকমলে চোরটি ভেবে দারোয়ানরা পেটায়
এমন সময় হট্টগোলে হাজির হলে সেথায়।

বীরের মতো এগিয়ে গিয়ে বাঘকে খোঁজো কোথায়
বহুরূপী ছিনাথ কাঁদে ঘাট হয়েছে মশায়!

পিসেমশাই বলল তেতে ল্যাজটি কেটে নে রে
পিসির বাণী— লাগিয়ে নিও, লাগবে তোমায় বেড়ে!

হাঁড়ি ভাঙল কে ■ গৌরব সরকার

হাঁড়ির কি দোষ!
যে যা বলে বলুক, সব না শুনলেই হল
কান দুখানাও কিছু সময় বিরাম না হয় পেল।
মুখখানাও কম বেয়াড়া নয়, যা নয় তাই বলে,
পরের কঠিন সময় এলে একটু বেশিই চলে।
হাতদুখানাও কম কিসে ভাই খালি নিশপিশ করে
বেমক্কা কিল গুঁতোর নেশার সদ্ব্যবহার করে।
সব বেআক্কেলে এক হলে কি হাঁড়ি ঠিকঠাক থাকে?
হাঁড়ির কি দোষ, ভাঙতেই পারে!
যদি দুষ্টু গরু তোলপাড় করে রান্নাঘরে ঢুকে।

হাসি ■ প্রদোষ কান্তি সিংহরায়

বললে সবে মুচকি হেসে
বাঞ্ছারামের মেসো,
অট্টহাসি হাসবে না কেউ
মুচকি হাসি হেসো।

অট্টহাসি হাসলে পরে
ধরবে পেটে খিল,
দিনে রাতে পোকা পেটে
করবে যে কিলবিল।
হাসলে জোরে ভাববে সবে
এটা একটা পাগল,
আসবে না কেউ ধারে কাছে
কিবা মানুষ, ছাগল।

হাসির চোটে আঁতকে উঠে
কেউবা পটল তোলে,
হাসতে গিয়েই অনেক লোকে
অনেক কিছু ভোলে।
হাসলে জোরে নোংরা দাঁতে
সবার নজর পড়ে,
হাসলে জোরে সারা শরীর
আপনা হতেই নড়ে।

মুচকি হাসির অনেক মজা
অনেক রকম মানে,
সত্যিকারের হাসি বলো
কজন হাসতে জানে?





বিনোদন ■ দুর্গা শংকর দাস

এই তো দেখ
খেলছি এ গেম
এটি নয়কো জুয়া
আনন্দে ভাই
সময় কাটাই
অন্য সবই ধোয়া।

জীবনটা এক আস্ত জুয়া
কখন যে কি হয়,
যা ইচ্ছে
তাই করে বেড়াই
প্রাণে নাইকো ভয়।

মানুষ গড়ি
মানুষ পড়ি
সবকিছু ঠিক বুঝি,
পয়সা দিয়ে
ফাটকা খেলে
বিনোদনটা খুঁজি।

বড় দাদা ■ শিবশঙ্কর বক্সী

মুখখানা করে ভার, নিয়ে দারুণ যন্ত্রণা গায়ে শেষে
গজা ফেরে হেডস্যারের ঘর থেকে প্রবল কেসে কেসে।
আমি বলি তাকে কিরে কি হলো,
এভাবে তোকে কে এত মারলো?

বলবো কি আর ভাই
বলতে লজ্জায় মরে যাই,
খারাপ কাজ করে শাস্তি, সেতো সবাই পায়
ভাল কথা বলা যে অপরাধ সেটা ভাবা যায়?
গজা বলতে চায় আরো অনেক কথা,
আমি শুনি, না শুনলে পাবে মনে ব্যাথা।

মেয়েদের স্কুলে হেড দিদিমণিকে বলে—'বড়দি আছেন ভালো?'
আমি ভাবি ঠিকই তো বলে, তাতে কি আবার হলো!

গজা বলে হেডস্যারকে বলি 'বড়দা আছেন কি ভালো'।
শুনেই বেত দিয়ে আমায় কি মারটাই না মারলো।

আজব হিসাব ■ যাদব চৌধুরী

মানুষ পুতের শীতের সময় কতো শীতের পোশাক
ভূতের বেলায় একটিও নয় কেমন আজব হিসাব!
আবার বলে শীতটা নাকি কামড়টা দেয় হাড়ে
মাংসে থাকে চর্বি কিছু সেই তো শীতকে মারে।
মানুষ পুতের হাড়ের ওপর মাংস প্রলেপ থাকে
তার ওপরে চর্বি দিয়ে শীতকে চেপে রাখে
তবু তো সে গায়ের ওপর পোশাক খালি চড়ায়
সেই মানুষই নিজের দয়ার বড়াই করে বেড়ায়।

কিন্তু ভাবো ভূতের পুতের হাড়টুকু সম্বল
চিতাতে বা মাটির গোরে মাংস ধুয়ে জল
তবু শীতে ন্যাংটো ঘোরে সুতাও জোটে নাকো
তোমরা যে সব মানুষগুলো শরীর ঢেকে রাখো।
একটু দয়া করো ভূতে তোমরাই বংশজ
তাঁদের জন্য করো কিছু তোমারই অগ্রজ।
উলের চাদর ও সোয়েটার দাও গো ভূতের পোনায়
বিশ্বাসে যে মিলে বস্তু তর্কে আজব শোনায়।

উঃ! ■ অমর কুমার দাস

সেদিন অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে
ফণী এসে ছিল.....
বুঝিনি
তেইশেই তুমি এলে
ভেতর ঘরের দরজা খুলে গেল
অনেক প্রশ্নের অনেক মনের,
যুদ্ধ বেধে গেল

এখন পাথর ঠুকছি
পাথর ভাঙছি
নিবিড় সত্য গোপন করার
ফন্দি আঁটছি
রাত জাগছি নোখ খুঁটছি
এ জীবনের এক রাশ প্রত্যাশা
ঘূর্ণীপার্কে উড়ে যেতে দেখছি
তবু হাল ছাড়াছি না
মানতে পারছি না।



বড়ার ছড়া ■ উৎপল সিনহা

বড়া খেয়ে ছড়া লেখা
যায় বড়ো সহজেই,
বড়া নিয়ে বড়ো বড়ো
কথা তুমি কহো যেই!

ডাল বড়া তাল বড়া
বেসনেরও বড়া হয়,
তাই বলে হামবড়া
কখনোই বড়া নয়!



জামাই ষষ্ঠী ■ সাগ্নীক কুমার ভুঁই

পরান বাবুর চিন্তা ভারি,
আসছে জামাই ষষ্ঠী।
আগুন বাজার; পকেট ফাঁকা
হবে কি জামাই তুষ্টি?

সারা হয়েছে নিমন্ত্রণ;
জামাই রেখেছে আমন্ত্রণ।
আজ বাদ কাল, আসবে চলে,
জামাই যখন তখন।

এই পড়েছে মনে—
জামাই কে সে ধরলো ফোনে,
মনে ছিলো অনেক আশা,
বাজার গরম, পকেট ফাঁকা,
মনে রেখো না বাবা হতাশা।

এবার তুমি জামাই ষষ্ঠী,
ফেসবুকেতে সারো।
ফল-মিষ্টির ক্যাটালগ,
পাঠিয়ে দিচ্ছি, খান বারো।

জামাই বলে সবই হোলো,
শাশুড়ি ফোঁটা এবার মোলো?
পরান বলে সার্চ করে
জুটিয়ে নিয়ো, খান ষোলো।

ফি বছরে ঘটা করে
জামাই ষষ্ঠী জানবে,
শাশুড়ি গেলে পরপারে,
এই পরান জুটিয়ে একটা আনবে।



ঘোর কলিকাল ■ লক্ষ্মীকান্ত সিং

যুগটা এখন ঘোর কলিকাল
সাপের মাথায় ব্যাং
অসৎ লোকের জয় জয়কার,
সৎ খাচ্ছে ল্যাং।

সংসার চলবে কেমন করে
চিন্তিত বাবার মন,
আদরের ছেলে বলে আমার চাই
সুন্দর স্মার্টফোন

বাচ্ছা ছেলেও চাইছে খেলতে
মোবাইল ফোনের গেম,
অনেকে আবার বেড়ায় করে
টাইম পাশের প্রেম!

প্রকৃতিও ঠুকবে এবার,
যুগের সঙ্গে তাল?
বসন্তের আকাশে কালো মেঘ,
যেন অভদ্রা বর্ষাকাল।

বিভ্রাট ■ তপনকান্তি মুখার্জি

টেকো ছোঁড়া ভ্যাবলাকান্ত
দেখতে যাচ্ছে মেয়ে,
ধোপদুরস্ত কাপড়জামায়
গায়ে আতর দিয়ে।
ফেসিয়ালে মুখটি সাদা
কলপ মাথার চুলে,
ধুতির কোঁচা ধরে হাতে
চলছে হেলেদুলে।
মনে এখন স্বপ্ন অনেক
ভাবতে ভাবতে তাই,
চলছে পথে মিষ্টি হাতে
খুশির সীমা নাই।
এমন সময় পড়ল পা যে
নরম গোবরেতে
সড়াত করে গড়িয়ে গিয়ে
ভ্যাবলা মাটিতে।
ফাটল হাঁড়ি গড়াগড়ি
মুখে গালাগালি
অমন সাধের কাপড়জামা
গোবর-কুণ্ডলী।



অবিচনার ফল ■ শম্ভুনাথ মণ্ডল

মশামাছির বংশ বাড়ে
জল জমালে খালে;
গরুর পালে বাঘ পড়লে
রাখাল জড়ায় জালে।
ছিঁড়ে ফিরে আসার আশা
হয়ে গেলে ক্ষীণ;
ভারত ছেড়ে রাখাল পালায়
নেপাল কিম্বা চিন।

গরুচোর ■ বি. কে. স্বপন

বিচারক যেই গম্ভীর কণ্ঠে
বলল, "ওরে চোর,
গরু চুরির নালিশ দেখি
বিরুদ্ধে যে তোর!
কিছু যদি বলার থাকে
বলনা তড়িঘড়ি।"
চোর বলে, "স্যার, গরু তো নয়
এনেছিলাম দড়ি।
আর কিছু তো আনিনি স্যার,
যদ্দুর মনে পড়ে,
সামান্য এই ভুলের জন্য
আনলো পুলিশ ধরে।
বিচারক যেই বলল রেগে
"করব মেরে সরু",
চোর বলে, "স্যার, দড়ির শেষে
বাঁধা ছিল গরু।"

এক টাকাতে তিন'শ হাতি ■ তুহিন কুমার চন্দ

ওরে রমো কাল সকালে
বাংলাদেশে যাবি
সেখান থেকে হেঁটেই যাবো
স্পেন ও আবুধাবি।

রমেশ বলে সে আমি তো
যাচ্ছি প্রতিদিনই!
সূর্য থেকে রশ্মি এনে
করছি বিকিকিনি।

পিরামিডের দেশটা ঘেঁটে উটপাখিদের ছানা,
একটাকাতে বেচে দিলুম
তিন'শত এক খানা।

অনেক বেশি দাম পেয়েছিস
ওরে বোকা ছেলে,
রাশিয়াতে এক টাকাতে
তিন'শো হাতি মেলে।

কাল সকালে যাচ্ছি তবে বাংলাদেশের গ্রামে
মস্কো থেকে দুই পাগলে
দিল্লি এসে নামে।



তাদের সাথে আকাশ পথে
কাদের নাকি দেখা,
মেঘের ওপর বসে ছিলেন
বব্রুবাহন একা।

তারই নাকি মামায়,
জাপান থেকে সেরা খাবার এনেছিলেন জামায়,
এসব শুনে বললে রমেশ
সেবার ছিলাম ঘানায়,
আকাশ সুদ্ধ তারাগুলো
আটকেছি এক থানায়।

যাচ্ছি এখন চাঁদে,
ওখানটাতে ঠানদি আমার, পাথরে ভাত রাঁধে
লাগবে সময় কত? বললে আমায়— এই ধর না নিজের ইচ্ছেমতো!

লক্ষ্মী নামের ঝক্কি ■ রবীন কুমার দাস

শ্যামলা গড়ন দেখতে তাকে কালো মোটেও নয়
রোদে পুড়ে গাঁয়ের মেয়ে দেখতে যেমন হয়,
বুদ্ধিতে তার সঙ্গে পেরে ওঠায় আছে ঝক্কি
দষ্যি দামাল ওই মেয়েটার রাখলো কে নাম লক্ষ্মী!

সকাল থেকেই ঝুট ঝামেলার সঙ্গী কটা ছেলে
সারাটা দিন মাঠে-ঘাটে কাটায় শুধু খেলে,
সন্ধ্যে বেলায় কানাই কাকার ঘরে গোলমাল জোর
লক্ষ্মী মাকে বললে এসে মেয়েটা তোর চোর।
লক্ষ্মীর মা চেঁচিয়ে বলে কি করেছে চুরি
তোর ঘরে তো আছে কটা লাট্টু-লাটাই-ঘুড়ি,
কানাই বলে দেখবে এসো কি হয়েছে তার
সবাই জানে মুর্গী বেচে চলে যে সংসার।
মুরগীগুলো মেরে ওরা ফিষ্ট করেছে খেয়ে
এমন লক্ষ্মীছাড়া কি আর হয় গো গাঁয়ের মেয়ে?
গোলমালেতে যখন গোটা পাড়া গেছে জেগে
লক্ষ্মী বলে বেশ করেছি খেয়েছি তো রেগে!
এমন কিপ্টে বুড়ো তুমি তেঁতুল চেয়েও পাইনি
তাইতো তোমার কাছেতে আর মুর্গী চাইতে যাইনি,
এর পরেতে তোমায় খেয়ে কাল করব সাফ
শুনেই বুড়ো কেঁদে বলে করে দিলাম মাফ।

কানাঘুষো শুনছে লক্ষ্মী ঘুমের থেকে উঠে
কানাই কাকার বাড়ি গেল এক দৌড়ে ছুটে
নাড়াচাড়া করে দেখে দেখছে না চোখ খুলে
কাকা রাতে শ্বাসটা নিতেই গেছেন নাকি ভুলে?
তাইতো কাকার ঘুম ভাঙেনি চোখ খোলেনি ভোরে
নাড়ী টিপে লক্ষ্মী বলে ভয়ে কি গেছেন মরে?

'হাসি'-দু'অক্ষরের ছোট্ট শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সুস্থ ও খুশি জীবনের মহৌষধ। "রাম গোরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে হাসবো না-না-না-না" কবি সুকুমার রায়ের বিখ্যাত্ত কবিতার লাইন। আমাদের আশেপাশের এমন গোমড়া মুখের অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায়, যারা সহজেই প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান হয় না। তেমন সব মানুষের স্বভাব প্রকৃতিও এক হয় না। কেউ মিশুকে, হাসি খুশি মেজাজের তো কেউ একটু আত্মকেন্দ্রিক, নিজের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করে। আবার কেউ কেউ মুখের হাসি ধরে রাখলেও এক একটা মিছরির ছুরি। সে যে যার স্বভাবে অভ্যস্ত, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা আর দায় কোনটাই আমাদের নয়। আমরা প্রচেষ্টা করতে পারি মাত্র। আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতি....বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হয় আমাদের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। যেমন দুঃখ পেলে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। এবং আনন্দ কিংবা মজা পেলে মুখে হাসি ফুটে উঠে। চাপাস্বভাবের অর্থাৎ অন্তর্মুখি মানুষ ছাড়া আমাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক। হাসতে গেলে কোন টাকা লাগে না কোন খরচাও হয় না। তবুও কিছু মানুষ আছেন যারা হাসির পরিস্থিতিতেও হাসতে পারেন না। অনেক আবার মনে করেন যখন তখন হাসাটাই নাকি উচিত নয় তাতে তার ব্যক্তিত্বের ওজন কমে যেতে পারে। অনেকে আবার অতিরিক্ত হাসাকে ছ্যাবলামো বলে মনে করেন। হাসি যে আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করি না বা করার চেষ্টাও করি না।

আমাদের জীবন আধুনিক হওয়ার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের বৃত্তটা অনেক ছোটো হয়ে এসেছে। অত্যাধিক পরিবহন ব্যবস্থার সুবাদে বিভিন্ন স্থানে পাড়ি দেওয়ার সময় হয়তো অনেকখানি কমে গেছে; কিন্তু কাছের মানুষকে সময় দেওয়ার অভাবে সম্পর্কের দূরত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে। আর সেই জায়গা দখল করেছে অবসাদ মানসিক চাপ ও হতাশা।

গবেষণায় দেখা গেছে হাসি হার্টের পক্ষে খুবই উপকারী। বেশি হাসলে হার্টের অসুখ হওয়ার প্রবণতা অনেকটা কমে যায়। হাসি বিশেষত অট্টহাসি শরীরের যেকোনো অংশের ব্যথা কমাতে নিমেষে সাহায্য করে। হাসি মস্তিষ্কের "এনডরফিন" হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে যা ব্যথা দূর করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পূর্বেই বলা হয়েছে বর্তমানকালে আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী বিষণ্ণতা। হাসি এই বিষণ্ণতা কাটাতে ও চাপ দূর করতে বিনা পয়সার ঔষধের মতো কাজ করে। হাসলে মন প্রফুল্ল থাকে যা সমস্ত রকমের অবসাদ দূর করতে সাহায্য করে। হাসি, অনিদ্রা কাটিয়ে গভীর ঘুমের অন্যতম সহজ চাবিকাঠি বলেও অনেক গবেষক মনে করেন। রাগ, হতাশা, দুঃখ ইত্যাদি যখনই মনকে ঘিরে ধরবে তখনই এমন কিছু করতে হবে যাতে আমাদের মুখে হাসি ফোটে।

প্রাণ খুলে হাসলে আমাদের শরীরে সেরাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে নিমেষে আমাদের মন ভালো হতে শুরু করে।

এছাড়া একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে হাসার সময় আমাদের শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, যা রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। যখন আমরা হাসি তখন ফুসফুসের প্রতিটি কোনা বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পূর্ণ হয়। এমনটা হওয়ার দরুণ শরীরেও অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেখাই যাচ্ছে হাসির ফলে ফুসফুসের শক্তি বাড়ে এবং নানা রোগের প্রবণতা হ্রাস পায়। হাসি এক ধরনের ব্যায়ামের পর্যায়ও পড়ে। হাসির সাথে আমাদের শরীরের সঞ্চিত অতিরিক্ত ক্যালোরি বার্ণ হতে থাকে। শুধু তাই-ই নয়, হাসির সাথে সাথে আমাদের পেটে খুব চাপ পড়ে, ফলে সবদিক থেকেই ওজন হ্রাসের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়। হাসির এতসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখে লর্ড বায়রনের উক্তিটি খুব মনে পড়ছে— যখন সম্ভব হাসুন কারণ এটি হলো সব থেকে সস্তা ঔষধ।

হাসি জীবনকে অনেক সহজ করে দেয়, সরল করে দেয় বাঁচার দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা প্রায় প্রত্যেকে জানি যে একজন হাসিমুখের ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা সকলের কাছে যত বেশি; গোমড়ামুখো মানুষের গ্রহণযোগ্যতা ঠিক ততটা নয়। হাসিমুখের মানুষগুলোর সাথে সহজেই মিলেমিশে যাওয়া যায়, অচেনা হলেও খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নেওয়া যায়। অনেক জটিল সমস্যারও নিমেষে সমাধান করতে পারে কেবলমাত্র একটা আন্তরিক হাসি। কারও কোন সমস্যা নেই? সমস্যা ছাড়া জীবন হয় না। তাই সমস্যার সমাধান খোঁজাই তো জীবনের লক্ষ্য। আর লক্ষ্য ছাড়া জীবন অর্থহীন হয়। তাই সমস্যা আছে বলে মনখারাপ করে বসে থাকাটা কোনো রূপ বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। এ প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের একটি বিখ্যাত উক্তি প্রযোজ্য— জীবনে আমার অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু আমার ঠোঁটগুলো তা জানেনা। তারা সবসময় হাসতে থাকে।

সমস্যাসঙ্কুল জীবনে হাসির চাহিদা এতো বেড়ে গেছে যে অনেক স্থানে শাখা-প্রশাখা মেলছে "লাফিং ক্লাব" শুধু তাই নয় সেগুলো চলছেও সাফল্যের সঙ্গে। টিভির পর্দাতেও আজকাল হাস্য কৌতুকমূলক রিয়লিটি শো অনেক জনপ্রিয় হচ্ছে। কমেডি সিনেমার চাহিদা ও দর্শক আকর্ষণ বর্তমানে অনেক বেশি। এসব থেকেই বোঝা যায় মানুষের পছন্দ কোন দিকে ঝুঁকছে। আর সত্যিই তো কদিনের জীবনে যে ব্যক্তি প্রাণখুলে হাসতে পারে, সে-ই তো সব থেকে সুখী। আপনারাও ভেবে দেখুন হাসতে হাসতে জীবন কাটাবেন নাকি অযথা দুশ্চিন্তা করে চিন্তিত মুখে জীবন অপচয় করবেন।

পয়মন্তি ■ চয়নিকা

এই নিয়ে তিনবার মিনতি পোয়াতি। আগে দু'বারই মেয়ে হয়েছে, ক্ষান্তমণি আর আন্নাকালী। এবার পোয়াতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিনতির 'সাউরি' সরমা গ্যাছে পীরবাবার থানে মানত করতে। এবার ব্যাটা হলে নগদ একশো টাকার পুজো দেবে সরমা। প্রতিদিন মনে মনে ভাবে ঘরে একটা ছেলে না হলে ঘর থাকবে! এই ঘর জমি সব তো বেহাত হয় যাবে। এই ক'মাসে মিনতি উঠতে বসতে দুবেলা শাশুড়ির রক্তচক্ষু হজম করেছে, কখনো শুনেছে, "বউ, এবার কিন্তু নাতি চাই, নইলে বাপু মেয়েদের নিয়ে বাপের ঘরে ফিরে যেও মানে মানে। আমার ব্যাটা এতগুলো মেয়ের গতর বইতে পারবে না।" আবার কখনো শুনেছে "নাও বাছা, এই মাদুলিটা নাও, চান করে বাঁ হাতে বেঁধে নিও। তুমি যা অপয়া মেয়েছেলে, বছর বছর বেটি বিইয়ে যাচ্ছো। মেয়েগুলোকে পার করবে কী করে ভেবেচ সে কতাখানা?" মিনতিকে বিয়ের সময়ই মা শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছিল যে শাশুড়ি যা বলে মুখ বুজে শুনতে হয়, কথা মতো কাজ করতে হয়, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মে ওসব একটু আধটু সইতে হয়, কথায় কথায় বাপের ঘরে আসতে নেই তাতে বাপেরই মান যায় গাঁয়ে। মিনতি তাই সব শুনে প্রতিবারের মতোই চুপ থাকে নইলে হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়ে।

প্রতিদিনের মতো আজ সকালে ন'মাসের বড় পেটটা নিয়ে মিনতি উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছিলো। মেয়েগুলো উঠোনের একপাশ খালিগায়ে বসে নিজের মনে খেলছে। হঠাৎ তার কেমন যেন হতে থাকলো, সে জানে এ ব্যাথা কীসের। পেট যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাবে যেন। হাতের ঝাঁটা ফেলে মিনতি উঠোনেই বসে পড়ে মা গো বাবা গো করতে লাগলো। মিনতির বর নব বেরচ্ছিল মাঠের কাজে। আওয়াজ শুনে ছুটে এলো। এসে দেখে সরমা আর কাজের মেয়ে ফুলি দু'জনে মিলে বউকে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে। নবকে দেখে সরমা বলল, "আঃ মোলো যা, সঙের মতো দাঁড়িয়ে কী দেখচিস? বউ কি এই পেত্থম পোয়াতি হয়েচে নাকি। যা হারুর মা কে ডেকে আন।" হারুর মা মানে এই অঞ্চলের নাম করা ধাই মা, সবার বাচ্চা এই মহিলার হাতেই হয়। গাঁয়ের ও মাথায় একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিন্তু সেখানে ডাক্তার ঠিকমতো আসে না, ওষুধও পাওয়া যায় না আর তাতে গাঁয়ের লোকের বিশেষ মাথাব্যাথাও নেই। নব ছুটলো হারুর মাকে ডাকতে।

এখন দুপুর বেলা। মিনতির বাচ্চাটা হওয়ার পর মিনতির বারবার জ্ঞান আসছে আবার চলে যাচ্ছে, তার মাঝেই ধাই মা বলে গেছে আবার মেয়ে হয়েছে। মিনতির কাঁদার মতোও শক্তি ছিলো না, তবু ধাই মার কথা শুনে দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। মেয়ে বিয়োনো মিনতির কান্না দেখার কারোর সময় হয়নি আর। এখন শাঁখের আওয়াজে হঠাৎ মিনতি বেশ সজাগ হলো। আধ ভোজনো দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝলো এখনো বেলা আছে, তবে এমন অবেলায় কে শাঁখ বাজাচ্ছে। মিনতির মনে হঠাৎ একটা খুশীর দমকা হাওয়া এলো, তবে কি সে শুনতে ভুল করেছে? তার কি শেষমেশ ব্যাটা হয়েছে, তাই খুশিতে 'সাউরি মা' এমন শাঁখ বাজাচ্ছেন!

মিনতির মনে খুশিটা বিশেষ স্থায়ী হল না। ঘরের বাইরে ফুলির গলা পেলো। ফুলি কাওকে একটা চেঁচিয়ে জানাচ্ছে, "কাকীর বউটা অপয়া হলে কী হবে, মুংলি কিন্তু খুব পয়মন্ত, এবারেও বকনা বিয়েচে। তাই কাকী শাঁক বাজাচ্চে গো, ওবেলা মিষ্টিও খাওয়াবে বলেচে।" ওপার থেকে কেউ একটা কিছু জিজ্ঞাসা করলো, সেটা মিনতি শুনতে পেলো না, কিন্তু উত্তরটা বেশ পরিষ্কার শুনলো যে ফুলি বেশ হাহুতাশ করে বলছে, 'সে আর বলোনি গো, বউ আবার মেয়ে বিয়েচে। কাকী তো বলেচে দুরদুর করে দিয়ে আসবে বাপের ঘরে তারপরে আবার দাদাবাবুর বে দেবে। তুমিই বলো কাকীর আর কী দোষ! এমন মেয়ে বিউনি হলে ঘরে কেউ রাকবে! কাকী তো তবু ভালো মানুষ অনেক কল্লো বউয়ের জন্য। বাবার থান, পুজো আচ্চা, কিন্তু এই বউ তো এক্কেরে অলোক্কি, মেয়েই বিইয়ে চলেচে। মুংলিকে দেকো বচর বচর বকনা বিয়োয়, আর সাতে দুদের বন্যা। কোনোবার কিচ্ছু ঝামেলায় পত্তে হয়নি তো কাকীকে।" মিনতির শুনতে শুনতে হাসি পাচ্ছিলো। নিজের ভাগ্যের উপরে মরা ছাড়া আর গতি নেই তার কাছে, বাপের ঘরে গেলে মা-বাপের মুখে চুনকালি হবে, দুমুঠো খাবারও জুটবে নাকি সন্দেহ, ভায়ের ঘরে সে হবে গলগ্রহ। মরলে সে মেয়েগুলোকে নিয়েই মরবে আর পরের জন্মে মুংলির মতো হয়ে জন্মাবে সবাই মিলে। আজ যদি সে মুংলি হতো তবে তো সে পয়মন্তই হতো আর তার মেয়েরা হতো ঘরের লক্ষী।

বাড়ির পূব দিকে ছিল আমাদের মস্ত বড় পুকুর, তারপরে রথখোলার পুকুর। শুকনোর সময়ে দুটোর সীমানা নির্ধারণকারী ছোটো আলটি জেগে উঠতো, কিন্তু বর্ষায় মিলে হত এক মস্ত দীঘি। এর উত্তর দিকে ছিল আমাদের বাগান বাড়ি, গাছ গাছালিতে ভরা। সেই বাগান বাড়ির পূর্ব সীমান্তে বিশাল বাঁশঝাড় ও সাপ-খোপের বাসা, তার পরে একটু নীচু হালট, দশ-পনেরো গজ প্রশস্ত। তা-ই বর্ষায় দুই পুকুরের সাথে আমাদের বাড়ি ও বাগান বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া, সারা বছর নাব্য, বড় দিঘলি-কনকসার খালের সংযোগ সাধন করতো। পূর্ব উত্তর কোণায় খালের প্রায় লাগোয়া ছিল একটা বিশাল গাব গাছ, আর তার নীচে লেট্রিন। তখন গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার বাসা বাঁধত এই গাব গাছে, গ্রামের সমস্তগুলো ভুত থাকতো এর ডালে ডালে পাতায় পাতায়! রাতে কখনও যদি এর কাছাকাছি যেতে হোত আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিতে দিতে যেতাম। এই সূরার ছিল অসামান্য শক্তি, কোন ভুত-প্রেত আমাদের স্পর্শ করেনি কোনদিন। কোণায় যে বাড়িটি ছিল রথখোলা সন্নিহিত, লেট্রিনটি ছিল সে বাড়ির। ওরা মুসলমান ছিল না। আয়াতুল কুরসি ওরা পড়েনি তবে ও বাড়ির কাউকেও কখনও ভুতে ধরেছে বলে শুনি নি। ধারণা করি তাদেরও হয়তো কোন শক্তিশালী মন্ত্র ছিল। এছাড়া পুকুরের পূর্ব পাড়ে, বর্ষার তার গাঢ় সবুজ পাতা ও হিজল ফুল জল ছুঁয়ে থাকতো। জলের স্রোতে সেই পাতাগুলো নড়তো, আর প্রসারিত নরম হিজল ফুলের সূতা জলের বুকে আঁচড় কেটে অগভীর ক্ষতের সৃষ্টি করতো। অসামান্য ছিল সেই হিজলের জলকেলি।

একবার আমাদের গ্রামের গৌরাঙ্গদা নৌকা বাইছিল। সেই নৌকায় ছিল খুব সুন্দরী ও যৌবনবতী এক নারী, গ্রামেরই এক বৌদি। তার কপালে ছিল লাল সিঁদুর আর চোখে কাজল, চুল ছিল কোমর পর্যন্ত, যাকে বলা হত মেঘ কালো চুল। আর তার দেহে ছিল বর্ষা-হিজল যৌবন। আমি ছিলাম সেই ছোট নৌকায় আর সেই বৌদির ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, আড়াই কি তিন বছরের।

গৌরাঙ্গদা ছিলেন ভালো ছেলে, ভালো ছাত্র এবং বেশ ছিল তার সুনাম। সেই দিন হয়তো দিনটি ছিল সুন্দর এবং তার মন হয়েছিল উড়ুনচণ্ডি, তার কোথা থেকে কি মনে হল, তিনি নৌকায় একটি দুলুনি দিয়ে বললেন, "বৌদি দেই নৌকা ডুবাইয়া"? নৌকার দুলুনিতে বৌদি সন্ত্রস্ত হলেন। বললেন, "না লক্ষ্মী ভাই, না"।

বাচ্চা মেয়েটি কেঁদে উঠল। দাদা লজ্জিত হলেন। তার অর্বাচিন রসিকতার রেশ কেটে উঠবার আগেই নৌকা এসে গেল পূর্ব-দক্ষিণের সেই দুর্দান্ত স্রোতের জায়গাটিতে। যেন কোনো অশুভ শক্তি প্রচণ্ড গতিতে নৌকাটিকে টেনে নিতে লাগলো,

গৌরাঙ্গদা, বৌদি, আমি সাঁতারে রেহাই পেলাম। বৌদির ছোট্ট মেয়েটি নিখোঁজ হয়ে গেল, জলস্রোত তাকে কোথায় নিয়ে গেল কোন হদিসই করা গেল না। দুদিন পরে তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল হিজল গাছের ঝোপের মধ্যে জলে ডুবানো ডাল পালার মাঝে।

সারা গ্রামে শোক নামলো, কেউ কেউ গৌরাঙ্গদাকে তিরস্কার ও দোষারোপ করলো যে, সেই ইচ্ছে করে এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে, যদিও তার কোন মোটিভ খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি সেই বৌদিকে কাঁদতে দেখেছিলাম পাগলীনির মতো আলু-ঝালু চুলে। আমি গৌরাঙ্গদাকে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে খালি হাসতে দেখেছিলাম।

তারপরে আমাদের গ্রামে এল যুদ্ধ। সেই দেশ আর সেই দেশ রইলো না। অপ্রকৃতিস্থ গৌরাঙ্গদার হাব-ভাব চাল-চলন দেখে মিলিটারিদের মুক্তিযোদ্ধা বলে সন্দেহ হল, তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল। আর কন্যা-হারা বৌদি বাংলার অজস্র নারীর মতো অসংখ্য বন্য বরাহের নখরের আঁচড়ে নাই হয়ে গেলেন। আজও চোখে ভাসে তার কপালে লাল সিঁদুর, চোখে কাজল....

সেই বৌদি, সেই গৌরাঙ্গদা কোথায় হারিয়ে গেলেন। না, তাদের কোনো চিহ্ন বা স্মৃতি সেই গ্রামে আর নেই। সেই গ্রাম, সেই পুকুর সেই উন্মত্ত কাটালের হিজল বীথিও ধুয়ে মুছে গেছে পদ্মায়। সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা কেউ মনে রাখেনি এবং আমি যখন চলে যাবো সেও মুছে যাবে চিরতরে, মানব জাতির স্মৃতি হতে।

একটি অলৌকিক ভাঙ্গনের গল্প ■ দীপ্তনীল ব্যানার্জি

(১)

খুব স্বাভাবিকভাবেই অলক্ষ্মী আর অপয়া বউ এক বছরের বেশি সংসার করতে পারেনি।

(২)

বিয়ের আগের বেড়াতে যাওয়ার ঘটনাটা দীপ্ত খুব ঘটা করে মাকে বলেছিল। যদিও সেটা বিয়ের পরে। তবে ঘটনাটা এমনই যে না বলে থাকতে পারেনি। এমনিতেই ওকে অফিসের কাজে তিন-চার দিন করে বাইরে যেতে হত মাঝে মাঝে। তাই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সংহিতাকে নিয়ে দু'দিনের জন্য পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরতে গেছিল দীপ্ত। উদ্দেশ্য দু'জন দুজনকে একটু কাছ থেকে জানা। থাকার ব্যবস্থা দীপ্তরই অফিসের সমরদা ওখানে নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে করে দিয়েছিলেন। ফলে হনিমুনের একটা ডেমো হয়ে গেছিল। ঘটনাটা ঘটে আসার আগের

দিন বিকেলে। সমরদার বাড়ির পুরনো কাজের লোকটির সাথে চারপাশটা ঘুরে দেখছিল দুজনে। একটু দূরেই জঙ্গল গজিয়ে ওঠা একটা পুরনো বাড়ি। যদিও কাঠামো মোটামুটি ঠিক আছে। দরজা জানলাও অটুট। তবে সবই বন্ধ। দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কেউ আছে কি না। বাড়িটা পেরিয়ে হঠাৎ করেই সংহিতা জিজ্ঞেস করল কেয়ারটেকারটিকে— 'চঞ্চল কাকু; ভেতরে এরকম ভাবে সুর টেনে টেনে কেঁদে যাচ্ছে কে?"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল দীপ্ত "কোথায়? কার কথা বলছ?" ততোধিক অবাক হয়েছিল সংহিতা। "এ আবার কী? একনাগাড়ে মেয়েটা কেঁদে যাচ্ছে এত 'লাউডলি' শুনতে পাচ্ছ না? কি চঞ্চল কাকু? তুমি শুনতে পাচ্ছো তো?"

গম্ভীর হয়ে গেছিল চঞ্চল সাহা। বলেছিল "হুম। তাড়াতাড়ি চল একটু। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাড়ি যেতে হবে।" সেদিন আর কিছু বলেনি চঞ্চল কাকু।

আসার ঠিক আগে দীপ্ত আর সংহিতাকে জানিয়েছিল "দিদি কি বল আমি জানি না। কালকের ওই বাড়িতে আমি কিছু শুনতে পাইনি। ওই বাড়িতে কেউ থাকে না। পাঁচ বছর আগে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিলো। বিয়ের আগে বাচ্চা এসেছিল বলে। তারপর তার বাড়ির লোক চলে গেছে অন্য জায়গায়। তারপর কেউ কেউ ওই বাড়িতে কান্নার আওয়াজ শুনেছে। সেটা ভুল হতে পারে। কিন্তু তুমি কিছু না জেনেই শুনতে পেলে এটা জেনেই অবাক লাগছে।"

সত্যিই ভীষণ অবাক লাগছিল দীপ্তর। সংহিতা যেন একটু বিষণ্ণ। কিন্তু অবাক নয়। আসতে আসতে দীপ্ত জানতে চেয়েছিল ব্যাপারটা কি?

খুব আস্তে সংহিতা বলেছিল এই ব্যাপারটা ছোটবেলা থেকেই ওর হয় মাঝে মাঝে। আগেও চার- পাঁচবার হয়েছে। কেমন একটা অস্বস্তি। একটা অজানা আশঙ্কা, ভয়। আর সব সময়ই সত্যি হয় সেটা।

শুনে বাচ্চাছেলেদের মতই অবাক হয়েছিল। নিজের বউয়ের এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে শুনে গর্বও হয়েছিল। যদিও বিয়ের তিনমাস পর মা শুনে বিশেষ পাত্তা দিলনা। শুধু বলল সবাইকে এইসব বলিস না। সময়ের সাথে ফিকে হয়ে গেল সব কিছু। সুখী সংসার এগিয়ে গেল আরও তিনটে মাস।

(৩)

ভীষণ ভাবে ঘ্যান ঘ্যান করে "ধনলক্ষ্মী" চিটফান্ড থেকে দীপ্তর টাকাগুলোকে উইথড্র করাল সংহিতা। কেমন একটা কু গাইছিল মনে। বারো লাখ টাকার পুরোটা তুলে নেওয়ার একমাসের মধ্যেই বিশাল বড় কেলেঙ্কারিতে পুরো সংস্থাটাই উঠে গেল। হাজার হাজার লোক পুরো সর্বস্বান্ত। আর দীপ্ত? বুঝতে পারছে না ভগবানকে পুজো দেবে, না সংহিতাকে প্রণাম করবে। জিজ্ঞাসা করল "কি করে জানলে?"

"তোমাকে তো আগেও বলেছি দীপ্ত। ওরকম ভাবে বলতে পারি না। কেমন একটা অস্বস্তি হয়। এক্ষেত্রেও কদিন ধরে সেটাই হচ্ছিল। আর তাই তো 'ন্যাগ' করে যাচ্ছিলাম তোমার কাছে।"

কৃতজ্ঞতায় কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না দীপ্ত। মায়ের কাছে সংহিতার প্রশাংসা করা থামাতে পারছিল না। মাও একটু অবাকই হয়েছিল।

পরের ঘটনাটা একটু তাড়াতাড়িই ঘটল। দু'মাসের মধ্যে। ফ্যামিলির বয়স্কদের একটা বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। দার্জিলিং। দীপ্তর মা অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দুদিন আগে থেকে সংহিতা এমন জেদাজিদি শুরু করলো যে বাধ্য হয়ে প্ল্যান ক্যান্সেল করলেন। সত্যি বলতে কি আগের ঘটনাটা মনে ছিল। তাই হয়তো-না শোনার সাহস পাননি। ভুল যে করেনি সেটা যাওয়ার পরের দিনই বুঝতে পারলেন। সামান্য অসাবধানতায় তিস্তায় গাড়ি উল্টে দীপ্তর মেজমামা মারাই গেলেন।

অত দুঃখের মধ্যেও সন্ধ্যায় দীপ্তকে একা পেয়ে রজনীদেবী জিজ্ঞেস করলেন "কী ব্যাপার রে বাবু? বৌমার এই ব্যাপারটা নরমাল? আমার তো ভালো লাগছে না।" তুই একটু জিজ্ঞাসা কর ভালো করে। আমার তো এবার কেমন একটা ভয় ভয় করছে একসাথে থাকতে।"

"মা, নরমাল না সে তো বুঝতেই পারছি। তবে দেখো সব তো আমাদের ভালোর জন্যই হচ্ছে। ওর কিছু এক্সট্রা ক্ষমতা থাকতে পারে আবার এটাও হতে পারে যে দুটো ব্যাপার একটা 'আনইউসুয়াল কোইনসিডেন্স'। 'ইগনোর' করো। মা কে বললেও দীপ্ত নিজেই বোধহয় ইগনোর করতে পারেনি। তাই তিন মাসের মধ্যে ঘটা একই রকম আর একটা ঘটনা শেষ পেরেকটা পুঁতল। চাকরিটা গেল দীপ্তর। সংহিতা ওকে বলেছিল সাবধানে থাকতে। কিন্তু বারো কোটি টাকা ডিলের দুই পারসেনটে বাঁ হাতের ইনকামের লোভটা সামলাতে পারেনি দীপ্ত। হাতেনাতে ধরা, এনকোয়ারি আর ছাঁটাই।

এবার সত্যি রাগে ফেটে পড়লেন রজনীদেবী। "এভাবে চলতে পারে না দীপ্ত। ওই মেয়ের কোন প্রবলেম আছে। ওকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে চল। কিছু না হোক পয়া, অপয়া; লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী এসব তো কিছু থাকবে। ওর শুদ্ধি না হলে থাকা সম্ভব নয় এভাবে।"

সদ্য চাকরি যাওয়া দীপ্তরও কথাটা বেশ 'লজিকাল' মনে হল। সন্ধ্যে বেলা সংহিতা ফিরে আসার পর কফি খেতে খেতে কথাটা তুলল দীপ্ত। "হিতা তোমার মনে হয় না এই ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। মানে তোমার এই 'পারসেশনের' ক্ষমতাটা? এটা নিয়ে বোধহয় আমাদের একটু ভাবা উচিত। তাই না?"

"বিশ্বাস কর দীপ্ত আমার খুব ক্লান্ত লাগে এইসব ঘটনাগুলোতে। মন থেকে চাই যেন এসব না হয় আমার সাথে।"

হাতে চাঁদ পেল দীপ্ত। এককথাতেই সংহিতাকে রাজি করিয়ে শনিবার তিনজনে বেরিয়ে পড়ল পাণ্ডুয়ায় গুরুদেবের আশ্রমের উদ্দেশ্যে।

ঘণ্টা দুই পরে পৌঁছে সংহিতা দেখল গুরুদেব লোকটিকে এক নজরেই বোঝা যায় পুরো ভাঁওতাবাজ। এর প্রতি শাশুড়ির এত ভক্তি?

মন দিয়ে সব শুনলেন গুরুদেব। দেখলেন সংহিতাকে। বলা ভালো মাপলেন। বিধান হল কালকের ভালো দিনে মোটামুটি ছাপ্পান্ন হাজার টাকার একটি যজ্ঞ করতে হবে। আর.......

কন্যার শুদ্ধিকরণের জন্য একরাত গুরুর আশ্রমে থাকতে হবে। কারো সাথে যোগাযোগ করা যাবে না। ফোন অবধি রাখা যাবে না।

অবাক হয়ে শুনল শাশুড়ি বলছেন "গুরুদেব কাল তাহলে সকাল ন'টার দিকে আসি?" আশ্চর্য! দীপ্ত অবধি চুপ করে সব কথা শুনছে।

আর না বসে দীপ্ত কে বলল "আমি তাহলে আসছি দীপ্ত। নিশ্চয় তুমি এটা আশা করো না যে আমি এখানে এর সাথে রাত কাটাবো।"

"আরে উনি খুব ভালো মানুষ। ওরকম নন। মা অনেক দিন চেনে। আর একটা রাতের তো ব্যাপার। কিছু না হোক, পয়া, অপয়া; লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী এসব তো কিছু থাকবে।"

হতাশ ভাবে তাকাল সংহিতা। "একদম ঠিক দীপ্ত। তবে আজ আমি সিওর হলাম আমার এই সব হেল্প লাগবে না। ওগুলো কোইনসিডেন্সেই ছিল। নাহলে আমার ইনটিউশন আমার এত বড়ো ক্ষতি করত না যে তোমায় বিয়ে করতাম।" বাড়ির চাবি আছে আমার কাছে। তোমরা যখন ইচ্ছে গাড়ি নিয়ে এসো। আমি ট্রেনে চলে যাচ্ছি।" খুব স্বাভাবিকভাবেই অলক্ষ্মী আর অপয়া বউ এক বছরের বেশি সংসার করতে পারেনি।

পাড়ার ছেলে ছোকরারা এবার খুব উঠে পড়ে লেগেছে, তাদের পাড়ার দূর্গা পুজো হবে। এই পাড়ায় আগে যা হয়নি, এবার শরতে হবে তাই, পাড়ার মানুষদের আর সেজেগুজে পাশের পাড়ায় অঞ্জলি দিতে যেতে হবে না, মোটামুটি সকলেই বেশ আনন্দিত। উদ্যোগী ছেলেরা সকলেই প্রায় বেকার-ভবঘুরে টাইপের। তাই সাহায্যের হাত বাড়ালো পাড়ার সব বয়সী মানুষজনই। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগুয়ান ছেলেটি চাঁদা নিতে এসে তো মণ্ডলবাবুকে বলেই গেল বুক চাপড়ে, দেখে নেবেন জ্যেঠু, এমন পুজো আগে হয়নি এই আশেপাশের পাড়ায়। পেঁজা মেঘ বাতাসে শিশিরের গায়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভোররাতে। সকালে শিউলিতলার ভেজা ফুলগুলো নদীর ধারে কাশ ফুলকে সংবাদ পাঠাচ্ছে তার সুবাস ছড়িয়ে, মা আসছেন। ঢাকিপাড়ায় ঢাকিরা অভ্যাস করে নিচ্ছে আগমনী বিদায়ের সুর। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ছুটি ছুটি মেজাজ।

শরতের আকাশে একরাশ আলো ঢেলে মা এলেন ধরাধামে। চারিদিকে বাজলো আগমনীর সুর। পাড়ার মানুষজনেরও গোছগাছ কেনাকাটা শেষ। নিজের পাড়ায় দেখবে পুজো।

অবাক হয়ে মণ্ডলবাবু বিশ্বাসবাবুকে ডেকে বললেন, ও মশাই, ছেলেগুলো সব কোথায় বলুন তো? ষষ্ঠী চলে এলো, কিন্তু পুজোর প্যান্ডেল কই? ঠাকুরই বা আসবে কবে?

বিশ্বাসবাবু থেকে মালবাবু, চ্যাটার্জীবাবু সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল মুহূর্তের মধ্যেই লোফার ছেলেরা সব পুজোর নাম করে চাঁদা তুলে নিজেরাই সব মদ মাংস খেয়ে উড়িয়েছে নিশ্চয়ই।

আলোচনা হলো, এর একটা বিহিত অবশ্যই প্রয়োজন। তারা প্রত্যেকেই চাঁদা দিয়ে কৃতার্থ করেছেন ছেলেগুলোকে।

অনুসন্ধান শুরু হল। খুঁজে পাওয়াও গেল তাড়াতাড়ি, ছোটো পাড়ায় কোথায় আর লুকিয়ে থাকবে তারা। দেখা গেল লম্বা চাঁদোয়ার নীচে নাকে সর্দি রুক্ষ চুলের সারাবছর ভিক্ষে করা পাতা কুড়ানো বাচ্চাগুলো নতুন জামা পরে হাত চেটে খাচ্ছে গরম ভাত, শাক, মাছ।

মুরুব্বিগণ হিসেব চান, পুজোর বদলে এসব কী?

সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছেলেটি এগিয়ে এসে বললে, আসুন জ্যেঠু, আসুন কাকু, পুজো দেখে যান। আজ ষষ্ঠী, এরপর সপ্তমী নবমী তারপর দশমী এখনো চারদিন আমরা পুজো করবো এভাবেই।

দেখুন মা দূর্গাদের মুখগুলো কত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই চুপচাপ পিছনে ফিরে যাচ্ছে।

বেকার ছেলেগুলোর সঙ্গে রাস্তার দূর্গারা তখন একসঙ্গে বলছে, শুভ শারদীয়া জ্যেঠুরা। শুভ শারদীয়া।

রাজার ঠিকানা ■ চৈতালী রায়

সামনের টেবিলটাতে একগোছা রজনীগন্ধা। সদ্য গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা। রজনীগন্ধা আমি ভালোবাসি। এর গন্ধ আমায় পাগল করে তোলে। হঠাৎ মনে হলো সমস্ত রজনীগন্ধাকে মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিই—ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে, ছাদে—সর্বত্রই।

সেদিন পড়তে বসেছি—রাজা এলো। একগোছা রজনীগন্ধা নিয়ে। আমি তাকালাম। দেখলাম। ও ভীষণ খেয়ালী। কেমনভাবে যেন তাকালো। আমি জানতাম—ও ভুলে যাবে। অথচ ওগুলো আমাকে দিতে এসেছে।

কি যেন ভাবছিলাম পরিস্কার নয়। জটপাকানো। আমি রাজাকে ভালোবাসতাম। রাজাকে দেখেছিলাম। একদিন নয়। আঙুলে গোনা দিন নয়। অসংখ্য অসংখ্য দিনের অনেক মুহূর্তে। কি বললাম—ভালোবাসতাম? না না এখনও ভালোবাসি।

রাজা আমাকে ভালোবাসে কিংবা ভালো বাসে না। ও আমাকে এয়ারপোর্ট বেড়াতে নিয়ে যাবে বললো। আমি রাজি হলাম। যেদিন গেলাম ও কি ভীষণ গম্ভীর থাকলো। একসময় বলে দিলো—আর কখনও আসবে না। আমি নিয়ে যেতে পারবো না। অহেতুক জার্নিতে আমার কষ্ট হয়। কথাগুলো বলার সময় ওর ঠোঁটদুটো একটুও কাঁপলো না।

কলেজ থেকে ফেরার সময় রাজাকে দেখলাম। আকাশের দিকে মুখ তুলে কি যেন দেখছে। বললাম—রাজা ভালো আছো তো? চমকে উঠলো। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো—আমি রাজা নই। অথচ মনে হলো—এই তো রাজা। ওর চেহারার দিকে একপলক তাকাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম—না এ রাজা নয়।

'সংসার সীমান্তে' দেখার সময় আমার পাশে বসে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম রাজা আমার পাশে বসে আছে। ইচ্ছে হলো ওর হাত দুটো চেপে ধরি। বই শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম—রাজা, কেমন দেখলে? গম্ভীর হয়ে বললো—আমি রাজা নই। বুজতে পারলাম আবারও ভুল করলাম।

আমি রাজাকে ভালোবাসি। মন-প্রাণ দিয়ে। মন খারাপ করলে ওর সঙ্গে দেখা করি। কথা বলি। সুস্থ-অসুস্থতার খবর জিজ্ঞেস করি। ইচ্ছে হলেই চিঠি লিখি।

রাজা হাঁটে, কথা বলে, খায় ঘুমোয়, স্নান করে, বই পড়ে, ছবি আঁকে সিনেমা দেখে—ভালোবাসে মনুমেন্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কলকাতাকে দেখতে। গরীব দুঃখীদের মুঠো মুঠো পয়সা দিতে ভালোবাসে। শিল্পীদের ভালোবাসে। সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধা করে। আরো কত কি—

রাস্তার ধার ধরে হাঁটতে হাঁটাতে অরার সাথে দেখা হলো। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম রাজাকে দেখেছিস? বললো—আমি তো তার সাথেই দেখা করতে যাচ্ছি। বললাম রাজাকে তুই ভালোবাসিস। ও দ্বিধাহীনভাবে বললো—ভালোবাসি বইকি। আমি অবাক হলাম।

দিন সাতেক পরে রাজাকে দেখলাম ছবি আঁকছে। আপনমনে। ছবির মুখটা ঠিক অরার মতো। জিজ্ঞেস করলাম অরা এসেছিল? বললো অরা বলে কাউকে ও চেনেই না। উদগ্রীব হয়ে বললাম—যার মুখটা ঠিক তোমার ঐ ছবির মতো। হেসে বললো—ও তো আমার শিল্পী মনের কল্পনা। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

দক্ষিণেশ্বরে বাস থেকে নেমে দেখলাম—স্মৃতি দৌড়চ্ছে। বললাম—অত ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছিস? স্মৃতি বললো—রাজার সাথে দেখা করার কথা। ভীত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম—তুই রাজাকে ভালোবাসিস? অনেকদিন থেকে— বলে চলে গেল।

বেশ কিছুদিন বাদে রাজার সাথে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। ওর পাশে পাশে হাঁটলাম। কথা বললাম। বাদাম ভাজা খেলাম। গঙ্গার ধারে বসে জলের ঢেউ গুনলাম। নৌকার যাতায়াত দেখলাম। বাচ্চাদের সাঁতার থেকে জল ছিটোনো দেখে হাততালি দিলাম। ফেরার সময় বললাম—স্মৃতি এসেছিল। রাজা বললো স্মৃতিকে ও কখনো দেখেইনি।

২৯শে মে আমি হাওড়া গেলাম। কলকাতার বাইরে যাবো। কয়েক দিনের জন্য। রাজা এলো—ট্রেনে তুলে দিতে। ট্রেনে উঠে আমার বসার জায়গাটা ঠিক করে দিলো। আমার পাশে বসলো। হাসলো। কথা বললো। ট্রেন ছেড়ে দিতে রাজা নেমে গেল। আমি হাত নাড়লাম। রাজাও—

ফিরে এসে মিষ্টুর সাথে দেখা হলো। আমি ভয় পেলাম। ও নিজেই এসে বললো—আজ রাজার সাথে দেখা করতে যাবো। সেই যেদিন হাওড়া স্টেশনে গেছিলো—সেদিনই ওর সাথে দেখা হয়েছিল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম তুইও রাজাকে ভালোবাসিস? ও হেসে ফেললো।

এরপর একদিন রাজাকে দেখলাম—বালি ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আপনমনে জলের চেহারা দেখছে অথবা গভীরতা মাপছে। ওর কাছে গেলাম। বললাম মিষ্টুকে সেদিন আসতে বলেছিলে? রাজা উদাস হয়ে বললো ও নামের কাওকেই সে কখনো দেখা করতে বলেনি। আমি চুপ করে গেলাম।

সেদিন মধুমিতা বললো—রাজাকে ও চেনে। রাজা ওকে ভালোবাসে। ওর নামে ডাকে চিঠি আসবে। আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

একদিন অরাক জিজ্ঞেস করলাম—রাজার চোখদুটো কেমন বল তো? ও যা বললো চমকে উঠলাম।

স্মৃতিকে জিজ্ঞেস করলাম—ওর কথা বলার ভঙ্গিটা তোর মনে আছে? স্মৃতি সঙ্গে

সঙ্গে বলে উঠলো একদম স্পষ্টভাবে। নির্জনে বসে থেকেও আমি শুনতে পাই।

মধুমিতা বললো—রাজার চুলের গন্ধটা ওর নাকে এখনও লেগে আছে।

এইভাবে একে একে সকলকে জিজ্ঞেস করলাম—রাজার হাত,পা, নখ, মাথার চুল, হাঁটার কায়দা, সব নিয়ে। সকলেই এক একটি বিষয়ের বর্ণনা দিলো অথবা আমিই শুনলাম। দেখলাম—সবাই রাজাকে চেনে, ওর হাত চেনে, পা চেনে, কথা বলার ভঙ্গি চেনে, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি চেনে, হাঁটার কায়দা চেনে, চোখ চেনে, নাক চেনে, মাথার চুল চেনে— আগে জানতাম রাজা শুধু আমার পরিচিত। এবার বিরক্ত হলাম। ঠিক করলাম ওর সাথে আর যোগাযোগ রাখবো না। ওর দেওয়া ফুলগুলো মাটিতে ছড়িয়ে দিলাম। ভাবলাম ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে। রোজ একটু একটু করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। বেশ কতগুলো দিন বাদেও লক্ষ্য করলাম ফুলগুলো থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে। ঠিক আগের মতোই। অর্থাৎ ওর গন্ধটা কিছুতেই হারিয়ে যাচ্ছে না। আবার চঞ্চল বোধ করলাম—ওকে দেখার জন্য।

একদিন অরার সাথে দেখা হল। বললাম—রাজার ঠিকানা জানিস। অনেকদিন দেখা হয়নি। একবার দেখা করতাম। অরা হাতের চেটো উল্টে বললো ভুল হয়ে গেছে। বললাম— কি তুইও ঠিকানা খুঁজছিস? অরা ব্যাকুল হয়ে বললো পেলে জানাস। আমিও একবার দেখা করবো।

আবার একদিন শ্যামবাজার ট্রামডিপোর কাছে স্মৃতির সাথে দেখা হলো। ওকে রাজার ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করলাম। কিরকম উদভ্রান্তের মতো বলে উঠল—আমিও তো ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এই ভাবে একে একে আবার সকলের সাথে দেখা হলো। সবাইকেই রাজার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম। সকলেই বললো—ওর ঠিকানা নিতে ভুলে গেছে।

আমরা এখন সবাই রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওর ঠিকানা খুঁজছি। হাত খুঁজছি। পা খুঁজছি। চোখ খুঁজছি। মাথার চুল খুঁজছি। নখ খুঁজছি। আঙুল খুঁজছি। ভ্রূ (ভুরু) খুঁজছি আর মনে মনে ভাবছি ঠিকানা পেলে সে হবে সম্পূর্ণ আমার।

ইরাদেবীর রোজ ঘুম ভাঙ্গে ফুটবল পেটানোর শব্দে। তখন যদি ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকানো হয় দেখা যাবে ঘড়ির কাঁটায় ঠিক পাঁচটা পনেরো বাজে। ইরা মিত্র জানেন তার একমাত্র ছেলে কুশল ফুটবল অনুশীলন করতে মাঠে নেমে পড়েছে। আর ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাকি ছেলেরা এসে মাঠে অনুশীলন শুরু করে দেবে তাদের কুশলদা ও কোচের নেতৃত্বে।

এই গ্রামটার নাম রায়পুর। এই গ্রামের পূর্বদিকে একটি বিশাল মাঠ আছে। মাঠের শেষ প্রান্ত থেকে গভীর জঙ্গল শুরু হয়েছে। বিশাল বিশাল ফলের গাছ। সমস্ত রকম ফলের গাছ আছে। ওটা গ্রামের জমিদারদের বাগান। গ্রামের লোকেরা যেমন খুশি বাগান কে ব্যবহার করে কিন্তু পরিস্কার করে না। গাছ আগাছায় বাগান জঙ্গল আকার ধারণ করেছে। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, বিশাল মাঠ, দূরে সবুজ পাহাড় অসাধারণ সুন্দর রূপ দিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না।

এই মাঠের সীমানা ঘেঁসে একটা দোতলা বাড়ি। ওটা কুশলদের বাড়ি। কুশলের মা ইরাদেবী। সংসার বলতে কুশল, ইরাদেবী প্রভাকর মিত্র অর্থাৎ কুশলের বাবা। কলকাতায় এদের লোহার ব্যবসা আছে। খুব অবস্থাপন্ন হলেও জীবনযাপন খুব সাদামাটা।

সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটা পনেরো পর্যন্ত খেলা হবে। পনেরো মিনিট মাঠের ধারে বসে কিছু কথা বার্তা হবে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় মাঠ ফাঁকা। ছেলেরা বাড়ির পথে। পড়তে বসার সময় এবার। এটাই নিয়ম, এর ব্যতিক্রম কুশল পছন্দ করে না মেনেও নেবে না। মাসে দুটো রবিবার জঙ্গল সাফাই অভিযান। ছেলেরা কুশলকে খুব সমীহ করে চলে, ভালোবাসে খুব।

কুশল মিত্র কমার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সে কিন্তু ছাত্রনেতা নয়। কিন্তু সে যখন কোনো বিষয়ে কথা বলে তখন সবাই চুপ করে তার কথা শোনে। এমন কি বড়রাও তার কথা অধিকাংশ সময়েই মেনে নেয়। কুশল কে তারা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছেলে বলে থাকে। কুশলের নেতৃত্বে ছেলেরা থাকায় অভিভাবকরাও অনেকটাই নিশ্চিন্ত। বিকালে আবার অনুশীলন শুরু হবে পাঁচটা থেকে। এক্ষেত্রে সময়টা একটু বেশি। ছটা পর্যন্ত খেলার পর মাঠে বসে কিছু আলোচনা হয়। কখনো বা কোনো অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা তোলা, প্যান্ডেল যাবতীয় বিষয় এরাই করে থাকে। এ মাঠে কেবল খেলাই হয় না দূর্গা পুজো, চড়ক, মণীষীদের জন্মদিন পালন সব হয়। সবচেয়ে মজা হয় বিজয়া দশমীতে অনেক রাত পর্যন্ত কোলাকুলি, বড়দের পায়ে হাত দিয়ে ছোটোদের প্রণাম। আর মিষ্টি নিমকী, ঘুগনি খাওয়া। ইরাদেবী খুব সুন্দর ঘুগনি তৈরি করেন বলে সেদিন সবাই তার তৈরি ঘুগনি খাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন।

খেলাধূলা নিয়ে মেতে থাকলেও কুশল পড়াশোনাটা ঠিক করে। ইরাদেবীকে ছেলের লেখাপড়া নিয়ে কখনো চিন্তা করতে হয়নি। সব কাজ ঠিক সময়েই করে সে। ছেলেদের খেলার ব্যাপারে সে খুব সতর্ক ও সচেতন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে একটি জনপ্রাণীও মাঠে থাকবে না। এই কঠিন নির্দেশ সকলকে মানতে হয়। বৃষ্টি তো দূরের কথা যদি হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ ছেলেরা ছুটে কুশলের বাড়িতে চলে আসে। কাকিমা ঝালমুড়ি তৈরি করে খেতে দেবে, আদা দিয়ে চা তৈরি করে দেবে। হৈ চৈ হট্টগোল শুরু হবে। বৃষ্টি কমে গেলে কুশল সবাই কে এগিয়ে দিয়ে আসবে। যদি কখনো রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয় তাহলে ইরাদেবী জানেন সেদিন সারারাত তার ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ সে ঐ সমুদ্র রূপী মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকবে অনিমেষ নেত্রে।

সেদিন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে খেলা প্রায় শেষের মুখে। ছেলেরা বাড়ি ফিরে যাবে, এমন সময় হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি আর বজ্রপাত শুরু হতেই কুশল সব ছেলেদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকালো। হৈ চৈ করতে করতে সব ছেলেরা বৈঠকখানায় ঢুকে পড়লো। ইরাদেবী এসে সবাইকে হাত-পা ধুয়ে আসতে বললে সবাই তাই করল। ঝেঁপে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন। একটু পরে মুড়িমাখা বাটি সবার হাতে এসে গেল। সবাই তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। ছেলেরা জানে কাকিমা সবাইকে চা খেতে দেবে। ছেলেরা খাওয়া সেরে ভুতের গল্প শোনার জন্য ভুজু (রথীন) কে চেপে ধরলো। এই ছেলেটা গল্পের বই পড়তে খুব পাগল। গল্পের ক্লাস শুরু হল।

সন্ধে সাতটা নাগাদ মনে হল বুঝি বাড়ির ছাদ ও উড়ে যাবে। বৃষ্টির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ঝড়। মুহুর্তে খেলার মাঠটা সমুদ্রের রূপ নিল। জল থৈ থৈ খেলার মাঠে। কুশল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ইরাদেবী কুশলের হাতটা ধরে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এলেন। কুশলকে বললেন "গ্রামপ্রধানের বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়ে দে আজ সব ছেলে এখানে থাকে। কেউ বাড়িতে ফিরবে না। আগামীকাল যেন তাদের অভিভাবকরা এসে তাদের নিয়ে যায়।

বৃষ্টির এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ছেলেরা চেঁচামেচি করতেও ভুলে গেছে। কুশল ঘর থেকে বেরিয়ে টেলিফোন করতে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল তোদের কোনো ভয় নেই। সবার বাড়িতেই খবর দেওয়া হয়ে গেছে। পুনরায় ছেলেরা তাদের পুরনো ছন্দে ফিরে গিয়ে ছুট লাগালে কাকিমার রান্না ঘরে। রাতে খিচুড়ী খাবার বায়না ও আবদার তাদের গলায়।

রাত দশটা নাগাদ সব ছেলেরা পেটপুরে খিচুড়ি, আলুর তরকারি ও পাঁপড় ভাজা খেয়ে কৌতুহল বশত মাঠের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। এত নিশ্চুপ দেখে কুশলের মনে হল ছেলেগুলো এত চুপচাপ কেন?

কুশলদা দেখো মাঠটা যেন সমুদ্র, কিন্তু যেনমনে হচ্ছে ওখানে ফুটবল খেলা হচ্ছে। ‘একজন বলে উঠলো।

সবকটাকে তাড়িয়ে এনে বৈঠকখানায় বলল, শুয়ে পড় সবাই। কুশলের কথা অমান্য কেউ করবে না কুশল জানে। একটু এপাশ ওপাশ করে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লো। কুশল বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়ছে, সাথে ঝড়ের গতিবেগ। রান্নাঘরের কাজ শেষ করে ইরাদেবী সব বাচ্চাদের গায়ে ভালো করে চাদর চাপা দিয়ে উঁকি দিলেন বারান্দায়। বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো তার। ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি মা ও ছেলে। ঝড় বাদলে যখন কটা ছেলে এই মাঠটা আনন্দে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ তখন আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ শিখা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেল, পড়ে রইল পাঁচটা পোড়া কাঠকয়লার মতো দেহ। দূরে দেখা গেল একজন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে গিয়েছিল অনেকটাই দূরে বল কুড়োতে। দু'জনেই কয়েক মিনিট ভাবতে পারেনি যে কী হল। সম্বিত ফিরতেই তীর বেগে কুশল দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিল। ইরাদেবী ছেলেকে শক্ত করে ধরে নিষেধ করেছিলেন যেতে। এত বজ্রপাত যে কোনো শত্রুও যেন বাইরে না যায়। টেলিফোনে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল কানেকশান নেই। মায়ের নিষেধ অমান্য করেনি কুশল। মাত্র মিনিট কয়েক বাড়িতে ছিল ছুটে এসে দেহগুলো দেখে চিনতে পারেনি। অজ্ঞান হয়ে ঐ দেহগুলোর পাশে পড়েছিল। ইরাদেবী সামনে যে বাড়ি পেল সেখানে খবর দিয়ে ছুটে এসে কোনোমতে এক হাঁটু জল কাদামাটি ভেঙে ছেলেকে বারান্দায় টেনে তুলেছিলেন।

কুশলের অনেক দিন সময় লেগেছিল সুস্থ হতে। তার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোটা গ্রামটায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। আহত ছেলেটাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে সে ভালো হয়ে উঠেছিল। মাঠে অনেকদিন খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুশলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য গ্রামের লোকেরা আবার ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করে। অনেক কষ্টে কুশলকে রাজি করানো হয়। তাই শর্ত সবাইকে মানতে হয়।

ইরাদেবী দেখেন ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘরে। আবার বারান্দায় ফিরে এসে দেখেন কুশল সোফায় ঘুমিয়ে পড়ছে। স্নেহের সঙ্গে একটা চাদর ছেলের গায়ে চাপা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। আজ রাতে তার ঘুম হবে না। সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যের ঘটনা মা আর ছেলেকে ঘুমোতে দেয় না এরকম ঝড় বৃষ্টিতে। আজ তার মনে হচ্ছে এই বাড়িটা ছেড়ে অন্য কোনো বাড়িতে চলে যাবেন। ছেলের এত যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না।

আউট-আউট। বি. রয় বোল্ড। ক্লিন বোল্ড। আম্পায়ার মাথার উপরে বিশিষ্ট নির্দেশ সূচক আঙুল তুলে বি. রয়-এর উইকেট পতনের পরোয়ানা জারী করেছেন। 'আম্পায়ার'স কল ইজ কল।' তাই বি. রয় অর্থাৎ বন্ধন রায় কাঁধে ব্যাট ফেলে প্যাভিলিয়ন মুখী হয়েছে। ক্রিজে আসার পর মাত্র তিনটে বল খেলেছে বন্ধন। প্রথম বলটা একটু নিচু হয়ে এসেছিল। সাবধানী ও সতর্ক বন্ধন ওই বলটা খেলবার মতো কোনো ঝুঁকি নেয়নি। দ্বিতীয় বল টাতে গতি হঠাৎ বেড়ে যায়। বন্ধন ব্যাট চালিয়েছিল শেষ মুহূর্তে। কোনো রান সম্ভব হয়নি, বিপদ ও কিছু ঘটেনি। কিন্তু দিনের তৃতীয় বলটি সোজা এসে উইকেটে ধাক্কা দেয়। কিছু বুঝে ওঠার আগে বন্ধন রায় বোল্ড।

প্যাভেলিয়নে ফেরবার পথে, গ্যালারী থেকে বি. রয়ের উদ্দেশ্যে কিছু খিস্তি বর্ষিত হল। দর্শকদের আসন থেকে কে একজন হেঁড়ে গলায় বললেন—এটা পুরো হাফ কেলানে মাইরি। এমন পয়মাল কে কেন যে মাঠে নামায়। 'আবার একজন হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে বলে উঠলেন—"দাদা কি নেবুর বল এ প্র্যাকটিস করেছেন নাকি? এইচ.ডি. পার্ল কোথাকার।" বি. রয় অর্থাৎ বন্ধন রয় আজকাল দর্শকদের এইসব বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ভালো খেলতে না পারার জন্য এইসব অভিযোগ গালাগাল তো শোনাটাই স্বাভাবিক। তবে এ-সবে খারাপ তো লাগেই। কাঁটার আঘাত তো জ্বালা দেয়-ই।

বন্ধন কলকাতার একটি ক্রিকেট দলের একদা নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। একসময় কলকাতার ক্রিকেট বোদ্ধাদের কাছে মাঠের হিরো। ওর খেলার স্টাইল নিয়ে মিডিয়াতে নানা প্রশংসাসূচক আলোচনা হয়েছে। সবাই বলত 'গুরু, এ সিওর সচিন নইলে সৌরভ। অথচ, ইদানিং মাঠে গিয়ে ক্রিজে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারছে না বন্ধন। ব্যাড় প্যাচ যাকে বলে। সেদিন মা গীতা দেবী তাকে বলেছিলেন—খেলোয়াড় না হয়ে তুই যদি একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করতিস, তাহলে একটা চাকরি পেতিস বন্ধন।

বাবা মাকে বলেছিলেন—'প্লেয়ার হচ্ছে, না গুষ্টির মাথা হচ্ছে।'

একদিন এই খেলার সূত্রেই ভাস্বতী সান্যালের সঙ্গে ওর আলাাপ। বড়ো ম্যাচ ছিল ফ্লাড লাইটের আলোয়। বন্ধন সেদিন বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সংহার মূর্তিতে ব্যাট করেছিল। দর্শকদের অভিনন্দনে সেদিন ভেসে যেতে হয়েছিল ওকে। অপরাজিত থেকে বন্ধন সেদিন দেড়শো রান একাই করে বসে। ভারতী তখন টেলিফোন ভবনে চাকরি করত। ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে এসে বন্ধনকে বলে—'একটা অটোগ্রাফ প্লিজ। সেই প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর কতবার পার্ক স্ট্রিট, আকাশবানী ভবনের রাস্তায়, কফিখানায়, কিংবা আউটট্রাম ঘাটে দেখা হয়েছে দুজনের।

মিলেনিয়াম পার্কে যেতে যেতে একবার ভাস্বতী বন্ধন কে বলেছিল অ্যাই তোমাকে

ভালো খেলতে হবে কিন্তু। আমার যেন খুব গর্ব হয়। বন্ধন মৃদু হেসেছিল।

ইদানীং বন্ধনের খেলার সেই ধার নেই।

চার-পাশে অনুরাগীদের ভিড় নেই। ক্লাব কর্তারা এখন অনেকেই বন্ধনকে এড়িয়ে চলেন।

এক ক্লাব কর্তা দেবু দত্ত সেদিন ওকে ডেকে বলেছেন—'এই ক্লাবে আপনাকে রাখা যাবে না। নেক্সট সেশনে অন্য ক্লাব দেখুন।

খেলা পড়ে যাবার পর, ভাস্বতীও আজকাল ওর সঙ্গে যোগযোগ রাখে না। অথচ, আগে আগে ভাস্বতীর ফোন আসত রাতের দিকে। কোনো কোনো দিন বন্ধনও ভাস্বতীকে ফোন করত।

-হ্যালো

-কে?

-বলতো কে?

-জানি না।

-তবে রেখে দিলাম।

-এই শোনো শোনো। আজ বিকেলে একবার দেখা করো না আমার সঙ্গে।

-কেন, কি ব্যাপার?

-আমার অফিস-কলিগ মোহর আর সোনালী একবার সামনাসামনি দেখে কথা বলতে চায়।

-কখন যাব?

-ঠিক বিকাল সাড়ে-পাঁচটায়।

-ঠিক আছে, যাব।

আজকাল বন্ধনের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে ভাস্বতী। বন্ধন একদিন টেলিফোন-ভবনে ওর সাথে দেখা করতে গেলে ভাস্বতী ওকে বলেছে -তোমার জন্য মাঠে যাওয়া বন্ধ করতে হবে আমাকে। কি যা -তা খেলছে আজকাল তুমি।—

বন্ধন লোকমুখে জেনেছে, ইদানীং ভাস্বতী অফিস কলিগ সুদীপ্ত মুখার্জি বলে একে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে নতুন করে প্রেম শুরু করেছে।

বন্ধন ভাস্বতী-কে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছে ও একদিন ঠিক ঘুরে দাঁড়াবেই। ভাস্বতী সে-সব কথায় আমল দেয়নি। ফুটো নৌকায় কেউ উঠতে চায় না। বন্ধন তাই আজকাল এইসব কারণে দারুণ মানসিক অবসাদে ভুগছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে বন্ধন নিজেকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। নিজেকে বলে আমি একটা যাচ্ছেতাই আমি কেউ নই অথবা হতে পারি না।

সেদিন সকালে বন্ধন নিজের ড্রয়িং-রুমে বসে, ওর কোচ সিদ্ধার্থ মিত্তিরের ফোন এল—'মন খারাপ কোরো না। সব পেশাতেই মাঝে মাঝে ব্যাড় প্যাচ আসে। তুমি

আমার বাড়িতে এসো, কথা আছে। বন্ধন পরেরদিন সকালে কোচের লেক টাউনের ফ্ল্যাটে হাজির। কলিং বেল বাজাতে ওর মেয়ে কঙ্কনা দরজা খুলে দিল।

-বসুন। বাপি বাথরুমে আপনাকে বসতে বলেছেন।

বন্ধন সোফায় বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল।

কোচ এলেন।

তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে কঙ্কনার যোগযোগ নেই বুঝি। ও নাম করা ইন্টিরিয়ার ডেকরেটর। আর মা-মনি, ও হোল বন্ধন রায়। ভালো ব্যাটসম্যান। ইদানীং ওর খেলাটা একটু ডাউন পজিশনে। শীঘ্রই কাটিয়ে উঠবে নিশ্চয়ই।

কঙ্কনা মুগ্ধ চোখে বন্ধনের দিকে তাকালো। কপাল থেকে উড়ু উড়ু চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল—আপনার খেলা কখনো দেখিনি, বাপির কাছে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। আপনার খেলার স্টাইলটা অনেকটা নাকি মনসুর আলি খান পতৌদির মত।

বন্ধন লজ্জায় পড়ে যায় কঙ্কনার কথা শুনে।

কোচ বলেন—তুমি আজকাল মাঠে আসছ না কেন? কাল থেকে তোমায় মাঠে দেখতে চাই।

বন্ধন বিদায় নেবার সময় কঙ্কনা বলল—আবার আসবেন।

বন্ধন মনে মনে বলল—আমার এই অন্ধকার জীবনে তুমি আলো হবে? আমি তাহলে আর একবার ঘুরে দাঁড়াব।

সেদিন প্র্যাকটিস থেকে ফেরার পথে সামনে একটা স্যান্ট্রো গাড়ি এসে বন্ধনের সামনে দাঁড়ালো।

স্টিয়ারিং এ কঙ্কনা। হাসি-হাসি মুখে বলল উঠে আসুন। বাড়ি যাবেন তো?

বন্ধন সামনে উঠে বসল।

-প্র্যাকটিস সেরে ফিরছেন?

-হ্যাঁ

-বাপি বলছিলেন, মাঠে আপনি খুব ঘাম ঝরাচ্ছেন।

-তাই বুঝি। কিন্তু কনফিডেন্স পাচ্ছি না।

-পাবেন-পাবেন। শূন্য থেকে শুরু করুন।

বন্ধন মনে মনে বলল—তুমি তো জানো না কঙ্কনা। আমি একজন হেরো মানুষ। ভাস্বতী আমায় একলা ফেলে গেছে, সেই থেকে আমার ইচ্ছা শক্তিটাও তলানিতে।

ততক্ষণে বন্ধনের বাড়ি এসে গেছে।

বন্ধন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলল—‘আসুন না, মায়ের সঙ্গে, আলাপ করবেন।

কঙ্কনা বলল—আজ নয়, অন্যদিনে এসে মাসিমার হাতে চা খেয়ে যাব।

‘আপনি এলে ভালো লাগবে’ —বন্ধন বলল।

‘আসব তো। আমি একজন যোগ্য মানুষের হেরে যাওয়া দেখতে রাজী নই। কঙ্কনা বলল। গলির মোড়ে এরপর ওর গাড়ি মিলিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ক্লাব-পর্যায়ের খেলায় বন্ধন ভালো রান পেতে শুরু করেছে।

দলের তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে ওর জায়গা প্রায় পাকা। ইন্ডিয়া টিমে বন্ধনকে নেওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে শলা-পরামর্শ চলছে।

মিডিয়াগুলোতে বি. রয়-কে নিয়ে জোরদার জল্পনা শুরু হয়েছে।

বন্ধন বরাবর সৌরভ ভক্ত। মনে মনে বলছে—দাদা, যদি ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তাহলে আমি পারব না কেন? আমাকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।

বন্ধন ভালো খেলতেই দেবু দত্ত তাকে ফোন করে বলেছেন—

তোমার মতো ডিপেনডেবল ব্যাটসম্যানকে ক্লাব কখনো হাত ছাড়া করতে পারে? আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি?

বন্ধন আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারছে।

কঙ্কনা আজ ওর অফিসে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।

একটা হলুদ ট্যাক্সি ভাড়া করে বন্ধন আজ কঙ্কনার সাথে দেখা করতে এল।

কঙ্কনা তখন অফিসের ফাইলে চোখ রেখে ভারী ব্যস্ত।

-আসতে পারি?

-অবশ্যই। বসুন, কি সৌভাগ্য আমার।

-কেন?

-আমি একজন ভালো মানুষকে হারতে দিইনি।

-তুমি আমায় ভালবাস, কঙ্কনা?

কঙ্কনা মাথা নিচু করল। এভাবে ভালবাসায় সম্মতি একমাত্র মেয়েরাই জানতে পারে। বন্ধনের মনে হল, কোন দূরের পাহাড়তলীতে ওরা দুজন অঝোর ধারায় ঝর্ণার নিচে দাঁড়িয়ে ভালবাসায় ভিজে যাচ্ছে।

পরদিন কোচ সিদ্ধার্থ মিত্র বন্ধন কে ডেকে বললেন—

বলেছিলাম না, তুমি পারবে। বাই দ্য ওয়ে, কঙ্কনা আমায় বলেছে, ও তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে বিয়ে করতে চায়। আর একটা গুড নিউজ দিই, তুমি ইন্ডিয়া টীমে চান্স পেয়েছ।

স্বপ্নের গাড়িটা এভাবে সামনে এসে পড়বে, বন্ধন কখনো ভাবেনি।

বিকেলে কঙ্কনার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে দেখা। চারদিকে বড়দিনের আলোর মেলা।

কঙ্কনা বলল—'এই যে মশাই, কেমন লাগছে?

বন্ধন বলল—'কঙ্কনা, আমি আর হারবো না। আমি পারব।

দূরে কোথাও জনপ্রিয় শিল্পীর গান বাজছিল—

'চলে যেও না, আর দেরী নেই, আমি আসছি।'

কঙ্কনা বলল—সকালে গাছে গাছে ফুল ফোটে, কিন্তু কুঁড়ির উপর রাতের কুয়াশা আর ভোরের শিশিরের অনুষঙ্গ থাকা চাই।

বন্ধন বলল—তুমি সঙ্গে থাকো কঙ্কনা। আর দেরী নেই, আমি আসছি।

বর্ণার মন খারাপ হলে এসে দাঁড়ায় দক্ষিণের এই অলিন্দে। সামনে বিশাল নিম গাছ। সেখান থেকে মাটি নেমে গেছে দূরে, বহু দূরে। ধূ ধূ প্রান্তর। মুণ্ডিত মস্তকের মতো। মাঝে মাঝে দু-একটা পলাশ অথবা শিমূল গাছ। পত্রহীন। আরো অনেক দূরে ছোটো ছোটো কয়েকটা টিলা। ধূসর ন্যাড়া। আরো কিছু দূরে প্রকৃতির অরণ্যরাজি। সেখানে নানান হিংস্র জন্তুর বসবাস। বিকেল হলে সে মাঝে মাঝে নেমে আসে নিচে। কথা বলে নিমগাছের সাথে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। তারা ফুটলে ফিরে আসে নিজের আস্তানায়।

অগ্নিজিৎ এখানকার বন অধিকর্তা। দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকে নিজের কাজকর্ম নিয়ে। কোথায় চুরি করে চোরা কারবারিরা গাছ কাটছে, হরিণ মারছে এসব নিয়ে সারাদিন ব্যতিব্যস্ত। ইচ্ছে থাকলেও বর্ণাকে সেভাবে সময় দিতে পারে না। তারজন্য নিজেকে অপরাধী ভাবে। সময় পেলে বর্ণাকে নিয়ে শহরে যায়। কেনাকাটা করে। কোনো ভাল রেস্তারায় রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফিরে আসে। সেই সঙ্গে বছরে একটা করে ট্যুর। পাহাড়, সমুদ্র, অথবা অরণ্যে।

বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, সমুদ্র বর্ণার খুব প্রিয়। তাই অগ্নিজিৎ যখন এখানে বদলি হবার কথা বলেছিল, বর্ণা খুশি হয়েছিল। নতুন জায়গা, প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা। শুনেছে জায়গাটা কোয়েল নদীর কাছে। কলেজে পড়ার সময় অগ্নিজিৎ বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস 'কোয়েলের কাছে' পড়তে দিয়েছিল। খুব ভালো লেগেছিল তার। স্বভাবতই উৎসাহিত হয়েছিল সে। কিন্তু থাকতে থাকতে বুঝেছে কি একঘেয়েমি এখানে থাকা। যদিও জনা চারেক কাজের লোক আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে তো সব কথা ভাগ করা যায় না। তারা বেশির ভাগই আদিবাসী। অশিক্ষিত। কিন্তু তাদের মনে মানুষের প্রতি প্রেম ভালবাসার কোনো খামতি নেই। খুব সহজ সরল তারা। কমদামি পোশাক, সস্তা গহনা শরীরে, কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্বাসী। বন বাংলোর কাজ কর্ম দোকান বাজার রান্না সবই তারা করে। বর্ণাকে সেভাবে মাথা ঘামাতে হয় না। একটু দেখিয়ে দিলেই হলো। তাই সে সারাদিন বই পড়ে, গান শোনে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ করে। কিন্তু সব সময়তো এসব ভালো লাগে না। তাই সে নিচে নেমে আসে নিমগাছের কাছে।

এই রেঞ্জে আরো যে ক'জন বনকর্মী আছে, তাদের পরিবার দূরে অথবা শহরে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য অগ্নিজিৎ একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তার এই বন বাংলোয় সকলকে নিয়ে পার্টি করে। তখন বর্ণার ভাল লাগে।

নিজের একাকিত্ব, একঘেয়ে জীবনের কথা বলতে পারে না অগ্নিজিৎকে। কারণ সে-ই অগ্নিজিৎকে উৎসাহিত করেছিল এই প্রফেসনে আসার। কলেজে পড়ার সময় থেকে তাদের প্রেম, ভালোবাসা এবং পরবর্তীকালে পরিণয়। অগ্নিজিৎ-এরও বন, জঙ্গল পাহাড় অতি প্রিয়। তাই তাদের মধ্যে কখনো এ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়নি। কিন্তু

ভাবনা আর বাস্তবের মধ্যে যে এত ফারাক এখানে না এলে কোনো দিন বুঝতে পারত না বর্ণা।

হঠাৎ এদিকে অনেক লোকের আনাগোনা শুরু হলো। সারাদিন জিপ গাড়ির শব্দ। ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলা। তাদের হাতে নানান ধরনের যন্ত্র, কাগজ, পেন্সিল, আরো কত কী। এগুলো দেখতে ভালই লাগে বর্ণার। সাময়িক সুখ পায়। মানুষের গলার শব্দ শোনে। সময় কেটে যায়। সে অগ্নিজিৎকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বলোতো। এত লোক সমাগম। মাপজোক। জিপ গাড়ির ধুলো।

—সরকারের ইচ্ছে এখানে একটা ইকো ফ্রেণ্ডলি রিসর্ট করবে। তাতে সরকারের আয় বাড়বে। ভ্রমণ পিপাসুরা সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝে কয়েকটা দিন একটু বাঁচার জন্যে অক্সিজেন পাবে। বন্য জীবজন্তুর সাথে রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

—ভালই হবে। আমিও তাদের সাথে একটু কথাবার্তা বলতে পারব। মন হাল্কা হবে। বর্ণা বলে।

—আমি জানি তোমার এখানে থাকতে খুব অসুবিধা হয়। আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকি নিজের কাজকর্ম নিয়ে। তোমাকে বিশেষ সময় দিতে পারি না। তুমি যদি চাও তাহলে কিছু দিনের জন্যে মা-বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসতে পার।

—তার দরকার হবে না। তাছাড়া আমি চলে গেলে তুমি তো একলা হয়ে যাবে।

সেদিন রাত্রে বর্ণা অনেকক্ষণ কথা বলল নিমগাছের সাথে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। জ্যোৎস্না ভরা রাত। অজস্র তারার ভীড় আকাশ জুড়ে। বনজ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিগন্ত। বর্ণা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল দিগন্তের দিকে। জ্যোৎস্না স্নান সেরে ফিরে এলো ঘরে। মধুর আবেশ জড়িয়ে রাখে তাকে।

সকাল সকাল বড়বড় মেসিন জড়ো হলো এদিক ওদিক। কয়েকজন মানুষ কিছু শ্রমিক কর্মচারিদের কিছু আদেশ দিচ্ছে। তাদের হাতে বড়ো বড়ো হাত-করাত। তারা এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। নিমগাছের কাছে থামল তারা। বর্ণা ব্যলকনি থেকে নেমে এলো নিচে। দাঁড়ালো নিমগাছের কাছে। জড়িয়ে ধরল তার গা। হাত তুলে বাধা দিল, এ কি করছেন আপনারা? আপনারা কী পৃথিবীকে মরুভূমি করতে চান? এই গাছটাকে না কাটলেই নয়? এ আর কতটুকু জায়গা দখল করেছে? পাস থেকে একজন অফিসার , এগিয়ে এসে বলল, ম্যাডাম এটা সরকারের হুকুম। আমি শুধু আমার কর্তব্য করছি। আপনি সরে যান এখান থেকে।

বর্ণা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নিমগাছ আগলে। আপনারা কী জানেন না কিভাবে বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণতা। এভাবে গাছ কাটলে আমরা কেউ বাঁচব না। ধ্বংস হয়ে যাব।

আমাকে ক্ষমা করবেন ম্যাডাম। এটা সরকারী নির্দেশ। আপনি আমাদের বাধা দেবেন না। নতুবা রেঞ্জার সাহেবকে এবং পুলিশকে ডাকতে হবে। এবং সরকারী কাজে বাধা দেবার জন্য আপনার শাস্তি হতে পারে।

হাত করাত নিয়ে কয়েকজন এগিয়ে গেল নিম গাছটার দিকে। কাটতে লাগল নিম গাছের শরীর। মুহূর্তে ভূপতিত হলো নিমগাছ।

এত বিজ্ঞাপন, প্রচার—'একটি গাছ একটি প্রাণ', 'গাছ লাগান', 'দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলুন।' সরকারী কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা যাবে। সব লোকদেখানো। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল বর্ণা। কঠিন দৃষ্টি সামনে। মনে হলো কে যেন তার হৃদয় কেটে উপড়ে নিল। রক্তাক্ত, বন্ধুহারা হলো সে। সভ্যতার করাল গ্রাসে ছিন্নভিন্ন প্রকৃতি। না, সে আর থাকবে না এখানে।

বউনি ■ সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

অমরের মা জীবনী মরেনি। বেশ কিছুদিন হলো সর্দি-কাশি কফ বুকে নিয়ে এককোণে পড়ে থাকে। নামমাত্র কাপড়-সায়া-ব্লাউজ তাও দুর্গন্ধে ভরা।

সেই কবেকার কথা, বাড়ি ছেড়ে জীবনী সন্তানের খোঁজে বেরিয়েছে। পাবে কি করে। আশ্বিনের ঝড়ে হুগলী নদীর অববাহিকায় ট্রলার ডুবি হয়ে সলিল সমাধি। পথের দিকে তাকিয়ে লাভ হয়নি। ঘর ছেড়েছে সদ্য বিবাহিত বউমাকে রেখে। কিন্তু কালাচাঁদ ফিরবে না। মায়ের অবস্থা দেখে অবিবাহিত বড় ভাই সঙ্গে নিয়ে থাকে। সেই যে সঙ্গ আজও ছাড়েনি। সন্তান হারা মা-ই বোঝে বুকের যন্ত্রণা।

ট্রেনে স্টেশনে চেয়ে হাত পেতে আর কতদিন চলে। বেশ তো চলল। বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে। কালার মা আর ঘর মুখো হয়নি। সন্তান নিয়েই ফিরবে। মাঝে মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের সাথে বলে, কালাচাঁদ তুই এলি?

অমর কুড়িয়ে চেয়ে হাত পেতে এনে নিজের ও মায়ের সারাদিনের পেটের মধ্যে বসবাসকারী বড় রাক্ষসটার ব্যবস্থা করে।

আগেও করেছে আজও তাই। বেড়ার ফাঁকে নারকেল, ফলওয়ার দাগী পেয়ারা, আপেল, ন্যাসপাতি, পড়ে থাকা চিরুনি, বোতল এসব কুড়িয়ে এনে মায়ের পাশে বসে দোকানদারী করছে। মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারছে না। বিবর্ণ পাতার মতো অমরের চেহারা। এ ছবি কেউই আঁকেনি। সারাদিন বসে আছে। কেউই জিজ্ঞেসও করল না নারকেলের জোড়া কত? পেয়ারার কত দাম? এক বোতল জলও কেউ কিনতে আসল না। বরঞ্চ ট্রেনযাত্রীরা ওঠানামা করছে, কেউ হাসছে বলছে, অমরের ভ্যারাইটিজ দোকান। কিরে তোর জিনিস কেউ নিল? সে শুধু বলল, নাঃ সারাদিন বউনি হয়নি। এত মানুষ পেলাট্‌ফরমে কিন্তু খদ্দের নেই।

চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, মাঝখান দিয়ে সরু একটা পথ নেমে গেছে নিচের দিকে। ওখানেই গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো কতগুলি বাড়ি নিয়ে দহল গ্রাম। সেখান থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে এক আর্তনাদ "আমার মেয়েটাকে তোমরা কেউ দেখেছো গো"—

দহল গ্রামে থাকে সুকুরু মাহালী আর তার বৌ সুবলা এবং তাদের একমাত্র আদরের মেয়ে সাজু। সুকুরু চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। সংসার ভালো রাখতে সুবলা শহরে বাবুদের বাড়ি কাজ করে। সুখে দুঃখে তাদের ভালোই দিন চলছিল। কিন্তু একদিন বাগানে যাওয়ার পথে সাপে কামড়ে দেয় সুকুরুকে এবং অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও তাকে বাঁচানো গেল না। এরপর থেকে সুবলা মেয়েকে সাথে নিয়েই কাজে যায়। দিন যায় সাজু একটু একটু করে বড়ো হয়। শহরে দাস বাবুর একমাত্র মেয়ে রুবির সাথে সাজুর সখ্যতা গড়ে ওঠে। দাস গিন্নিও সাজুকে ভালোবাসে। রুবির খেলনাগুলো নিয়ে দু'জনে খেলা করে চিলে কোঠার ঘরে বসে। হঠাৎ একদিন রুবির দূর সম্পর্কের মামা আসে রুবিদের বাড়িতে। রুবি তার সাথে মামার পরিচয় করিয়ে দেয়। রুবির মা বলে, "জানিস ভাই সুবলার মেয়েটি বড়ো ভালো, কখনো মনে হয় না ও আমাদের বাড়ির কাজের লোকের মেয়ে। রুবির সাথে ওর ভীষণ ভাব। আমিও বেশ চিন্তামুক্ত থাকি। রুবি ওর সাথে খেলা করে আর আমি ওর ফাঁকে ফেসবুকে বন্ধুদের সাথে আলাপ সেরে নি। সুবলাকে বলেছি মেয়েকে এখানে রেখে অন্য বাড়িগুলিতে কাজ সেরে আসতে। " কাজ সেরে মা ও মেয়ে একসাথে বাড়ি ফেরে।

রুবির মামাও সাজুর সাথে ভাব জমাতে শুরু করলো। শিশু দুটি ভাবলো একটা বড়ো বন্ধু পেয়েছে খেলার জন্য। তারাও ভীষণ খুশী।

সেদিন রুবিদের বাড়িতে কালী পুজো। রুবির মা সুবলাকে বাড়ি যেতে বারণ করলো। মেয়েকে থেকে যেতে বললো। সুবলাও বৌদিমনির কথা মত রয়ে গেলো। পূজা শেষে মা ও মেয়েকে থাকতে দেওয়া হলো চিলে কোঠার ওই ঘরটিতে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর সুবলা গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ পাশ ফিরে বুঝতে পারে মেয়েটা যেন পাশে নেই। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সে এখানে সেখানে খুঁজতে শুরু করে। কিন্তু কোথাও না পেয়ে দাস গিন্নিকে ডাকাডাকি শুরু করে। সুবলার মুখে সব শুনে দাস বাবু চারিদিকে লোক পাঠায় সাজুকে খুঁজতে। পুলিশে খবর দেওয়া হলো। সকাল গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেলো কিন্তু সাজুর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। সাজুর চিন্তায় কারও হুঁশ নেই যে বাড়িতে আর একটা প্রাণী নেই। ছোটো রুবির মনে হলো মামাকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না। সে কোথায়? সাজু, মামা কেউ নেই? রুবি মাকে শুধায়। দাস গিন্নির মাথা ঘুরে গেল তবে কি তার ভাই সাজুকে নিয়ে পালিয়েছে? সুবলা মেয়ের শোকে পাগলের মতো হয়ে যায়। তার মুখে শুধু একটাই কথা—"তোমরা কি আমার মেয়েটাকে দেখেছো?"

এভাবেই দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। সাজু ও মামার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুবলা আর শহরে আসে না। শুধু দহল গ্রামের বাতাসে একটাই সুর ভেসে বেড়ায়—"তোমরা কি আমার মেয়েটাকে দেখেছো গো?............"

কামনার তাড়নায় ■ মৌতৃষা চৌধুরী

বিশ্বজিত পাল শহরের নামী ব্যক্তিত্ব। সেই ১৯-২০ বছর ধরে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। দল তাকে নাম-যশ-খ্যাতির চূড়ায় বসিয়েছে। অল্পবয়সে বহু মেয়ের সাথে সম্পর্ক ভাঙ্গা-গড়া প্রেমের খেলা সাঙ্গ করে, শেষে অর্থমন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করে। রাজনীতির গদি আরও পাকাপোক্তভাবে কায়েম হয়। বিশ্বজিতের স্ত্রী অপর্ণাও কম সুন্দরী নন। তাদের একমাত্র সন্তান-বিপাশা। বড়োলোকের আদুর মেয়ে গ্ল্যামারাস্ চেহারা, শৌখিন, হেলথ কনসাস। প্রথম জীবনে বিশ্বজিত ভাড়া বাড়িতে থাকতো। তারপর ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক মহলে পা রাখা। বুদ্ধিমান ছেলে, কোথায়, কখন, কাকে তেল মাখিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে হয় তা প্রথম থেকেই জানতো সে—এরপর নিজে পার্টির কাজে এতটাই মেতে গেল যে ওপরমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। কলেজেও খুব ভালো সুবক্তা ছিল বিশ্বজিত। পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কিন্তু তার একটাই দোষ, বড্ড বেশি দুর্বল ছিল নারীজাতির প্রতি। এই দুর্বলতাটা বিয়ের পরেও যায়নি। অপর্ণা মাঝে মধ্যে ধরে ফেললে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি আর বাকচাতুরী দিয়ে অপর্ণাকে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলতো। মন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করার পর আর কেরিয়ারে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শ্বশুরমশাইয়ের রেফারেন্স কাজে লাগিয়ে আজ বিশ্বজিত কোটিপতি। একটি নামী সংস্থার উচ্চপদে রয়েছেন। স্ত্রী অপর্ণা শখে একটি বুটিক চালায়। আর বিপাশা দেখতে দেখতে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে। পাড়ায় বিশ্বজিতবাবুর খ্যাতির অভাব নেই। মোটা অঙ্কের চাঁদা থেকে শুরু করে ক্লাবের পিকনিকে ডোনেশন, কালচারাল অনুষ্ঠানে ডোনেশন, এমনকি কিছু অনাথ আশ্রমে, নারীদের হোমে ডোনেশন দিয়ে মুষ্টিমেয় লোককে নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছে। কিন্তু মহিলামহলে বিশ্বজিত পাল সমালোচনার পাত্র, মহিলারা বলে, 'শকুনের চোখ' যেন্ নারীদেহের সর্বস্বটুকু গিলে খেতে আসছে। কিন্তু অপর্ণাদেবী এত মিষ্টভাষী, মিশুকে, পরোকারী মহিলা যে তার সামনে কেউ কিছু বলার সাহস পায় না।

বিশ্বজিত বাবুরা পাড়ায় এক নামকরা কমপ্লেক্সে থাকে—সেই কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি তিনি। বিশাল কমপ্লেক্স—জিম, সুইমিং পুল, সবকিছুর সুবিধাই রয়েছে। কমপ্লেক্সে মহিলা দ্বারা বড়ো করে দূর্গাপুজো। পুজোর ঠিক আগে আগেই

বিশ্বজিতবাবুদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে এল শর্মিলা আর তার স্বামী আকাশ। এতদিন ফ্ল্যাটটা ফাঁকাই পড়েছিল। আজকালকার বাজারে ফ্ল্যাটের যা আকাশ ছোঁয়া দাম, মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে। এতদিন তাই ফ্ল্যাটটা সেল হচ্ছিল না। কমপ্লেক্সের অধিকাংশ ফ্ল্যাটই হয় এখনও বিক্রি হয়নি, নয়তো কিনে ফেলে রেখেছেন অনেকে। এতদিনে অপর্ণার একটা কথা বলার সঙ্গী হল। শর্মিলা আর আকাশ নববিবাহিত দম্পতি। কর্মসূত্রে আকাশ পুনেতে থাকে। শর্মিলাও চাকুরীরতা, সেক্টর ফাইভে কাজ করে, আকাশ খুব চেষ্টা করছে কলকাতায় সেটেল হতে। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যে সুযোগ নেই সে কথাও শর্মিলা জানে। শর্মিলা আর আকাশ দুজনের বাড়িই দুর্গাপুরে। মাঝে মধ্যে ছুটির দিনে শর্মিলার বাবা-মা এসে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে যান মেয়ের ফ্ল্যাটে। আকাশ যখন কলকাতায় আসে, দুজনে একসাথে দুর্গাপুরে যায়। ঐ সময়টা দুজনেরই বেশ ভালো কাটে। এই শহরে শর্মিলা একা। বয়স মাত্র ২৫-২৬ হবে, চেহারার গঠন দেখে মনে হয় সবে ১৯-২০। মাঝেমধ্যে বিশ্বজিতের ফ্ল্যাটে তার আসা-যাওয়া, আর যখনই বিশ্বজিত ফ্ল্যাটে থাকে, তখনই হয় ম্যাগাজিন নয়তো খবরের কাগজ পড়ার অছিলায় সোফায় গা এলিয়ে শর্মিলার শরীরের খাঁজ উপভোগ করে। বিশ্বজিতের এই স্বভাব কেরিয়ারের গোড়ার দিক থেকে শুরু, কেরিয়ার বললে ভুল, কলেজ জীবন থেকেই। মেয়ে দেখলেই ভিতরের পৌরুষত্ব তার জেগে ওঠে। তাই নিজের যৌবন ধরে রাখতে রোজ সকালে আবাসনের নিজস্ব জিমে ওয়ার্ক আউট থেকে শুরু করে ডায়েট চার্ট ফলো করে খাওয়া-দাওয়া, তারপর প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে জগিং করে।

।। ২।।

মাঝে মধ্যে বিশ্বজিত অফিস ট্যুরে অথবা পার্টির কাজে বাইরে যায়। সেখানে কখনও বা লেডি এক্সিকিউটিভ, কখনও বা সেক্রেটারি জোগানটাও একদম গোছানো। কিন্তু আবার সেই কামনা জেগে উঠেছে শর্মিলাকে দেখার পর। কি অদ্ভুত একটা আবেদন রয়েছে তার সৌন্দর্য্যে। মাস দুয়েক হল ওরা নতুন ফ্ল্যাট কিনে এসেছে। এর মধ্যেই অপর্ণা আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। শর্মিলা বাইরে থেকে কিছু ভাল খাবার অর্ডার দিলে বিপাশাকে দিয়ে যায়, অপর্ণাও মাঝে মধ্যেই ব্রেকফাস্ট বা ডিনারে শর্মিলাকে ডেকে নেয়। শর্মিলা আর বিপাশা যখন মাঝে মধ্যে ওদের ডাইনিং-এ বসে গল্প করে আড়াল থেকে বিশ্বজিত শর্মিলার কোমর, বুকের খাঁজ দেখে; মনে মনে আরো গভীরে চলে যায়, বিশ্বজিত কল্পনারসে সিক্ত হয়ে আবেশিত হয় নিজের খেয়ালে। উফ! আর সেই সময় শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ যেন খাড়া হয়ে যায়। অর্থবল, প্রতিপত্তি সব থাকলেও, বয়সের সাথে সাথে অর্পণা আর বিশ্বজিতের দাম্পত্য জীবনে ভাঁটা পড়লেও তার শয্যাসঙ্গিনীর অভাব নেই। কিন্তু টাকার বিনিময়ে বা জোর করে কারোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করলেও রসনা তৃপ্তি ঘটে না। শর্মিলার সৌন্দর্য্য, প্রাণ

উচ্ছলতা, মিশুকে স্বভাব দিনে দিনে পাগল করে তুলছে বিশ্বজিতকে। রোজ জগিং করে ফেরার সময় দেখে শর্মিলা অফিস করে আবাসনের সুইমিং পুলে সুইমিং করে বাড়ি ফেরে। শর্মিলার ভেজা শরীরের গন্ধ বিশ্বজিতের শিকারী সত্ত্বাকে যেন জাগিয়ে তোলে। একলা ঘরে, রাত্রে ড্রিঙ্ক করতে করতে শর্মিলার ভিজে শরীর কল্পনা করে বিশ্বজিত। এভাবে সুযোগ চলে আসে একদিন। সুইমিং পুলের কাছে পরপর ৩-৪টি পোস্টের আলো খারাপ হয়ে যায়। আবাসিকরাও তাই অন্ধকারের জন্য বিকালের পর ঐ দিকে বেশি যান না। কিন্তু শর্মিলার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সেদিন শর্মিলাকে একা সুইমিং পোশাকে দেখে দুর্বুদ্ধিটা মাথায় নাড়া দিয়ে উঠল—এই অন্ধকারের সুযোগটাই কাজে লাগাতে চায় বিশ্বজিত। পরিকল্পনা মাফিক পরের দিন শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে সে। দুপুরে রেস্ট নেয়, সন্ধ্যে লাগার আগেই জগিংয়ে বেড়িয়ে পড়ে। সুইমিংপুলের পাশে লাগোয়া চেঞ্জিংরুমের আশেপাশে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকে শিকারী বাঘের মতন। সবুরে মেওয়া ফলে একথা বিশ্বজিত জানে। এভবে কতো মেয়ের যে সর্বনাশ করেচে সে যৌবনে তার কোনো হিসাব নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে শর্মিলাকে এগিয়ে আসতে দেখল বিশ্বজিত। এতটাই অন্ধকার জায়গাটা, আবছা অবয়বটা শুধু বোঝা যাচ্ছে। আজ শর্মিলার চলা ফেরাটা কিছুটা হলেও সন্ত্রস্ত। আগে থেকে বিপদের আভাস পেয়ে গেল নাকি? বিশ্বজিত নিজেকে আশ্বস্ত করল, তারপর চুপিসাড়ে এগিয়ে গেল শর্মিলার দিকে। একটা টু শব্দ করতে দেয়নি বিশ্বজিত। শর্মিলার কাঁধের তোয়ালেটা দিয়ে ওর মুখটা পেছন থেকে বেঁধে দিল। নরম শরীরটা কোলে নিয়ে চেঞ্জিং রুমে ঢুকে গেল। এরপর সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে শর্মিলার নরম শরীরে শিকারী বাঘের মতো থাবা বসালো। মুখ থেকে এবার তোয়ালেটা সরিয়ে নিল। তোয়ালে বাঁধা অবস্থায় চেঁচামেচি করার ফলে হয়তো গলাটা চোকড হয়ে গেছে। ভাগ্যিস নেতিয়ে পড়েছে, নাহলে তো লোক জড়ো করে ফেলতো। গালে দুটো টোকা দিতেই গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা। আর কিছু না ভেবে চুপিসাড়ে শরীরটা কোনক্রমে দু-পা হাঁটিয়ে নিয়ে সুইমিং পুলের জলে ঠেলে ফেলে দিল পরিকল্পনা মাফিক। জলে পড়লেই সম্বিত ফিরবে, তার আগেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে হবে। জগিং-এর চত্বরটাও একবার ঘুরে যেতে হবে, কটা বাজল এইভেবে ঘড়িটা দেখবে কিন্তু এত গাঢ় অন্ধকার যে সময়টা দেখতে পেল না। এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল এই ভেবে—যেখানে ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে না শর্মিলার পক্ষে ওকে চেনা দুস্কর। আর যদি চিনেও ফেলে কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। বায়োলজিক্যাল প্রমাণগুলো সুইমিংপুলের ক্লোরিন জলে ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সন্দেহের তীরটা উঠবে ওয়াচম্যানের ওপর কিংবা কেয়ারটেকারের ওপর। ওয়াচম্যান দেশে গেছে মায়ের শরীর খারাপ। আর কেয়ারটেকারকে বিশ্বজিতা টাকা দিয়ে একটা বিশেষ কাজে পাঠিয়েছে, সবই পূর্বপরিকল্পিত।

।।৩।।

জগিং থেকে ফিরে গা ধুয়ে হুইস্কির পেগ নিয়ে লিভিং রুমে সোফায় বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে মধুময় মুহূর্তগুলো অনুভব করছে, হঠাৎ বেল বেজে উঠল। অপর্ণা দরজাটা খুলে দিল। হঠাৎ আসা অতিথিকে দেখে বিস্ফোরণ ঘটে গেল বিশ্বজিতের। নেশার ঘোর ছুটে গেল—আকাশ আর শর্মিলা এসেছে। সুন্দর করে সেজেছে শর্মিলা, পরনে শাড়ী। আজ ওদের বিবাহ বার্ষিকী। বিপাশাকে জানাতে একদম ভুলে গেছে, তাই কিছু খাবারের পার্সেল নিয়ে এসেছে সবার জন্য। বিপাশা নিশ্চয়ই খুব রেগে গেছে, ওকে প্রমিস করেছিলাম আজ থেকে সুইমিং শেখাবো, কিন্তু ভোরের ফ্লাইটে আকাশ এসে গেল—দুজনে চুটিয়ে ঘুরলাম। আজ তাই অফিসও যাইনি। "হঠাৎ যেন তীর এসে বিঁধল বিশ্বজিতের বুকে। অপর্ণা বলল—

"ও তো সেই সন্ধ্যায় সুইমিং শেখার নাম করে বেরিয়েছে, আটটা বেজে গেল—কই আমি তো ভাবলাম তোমার ফ্ল্যাটে গল্প করছে নিশ্চয়ই।"

বিপাশা কখনও কোথাও মাকে না বলে যায়নি। হঠাৎ ওয়াচম্যান ও কিছু লোকের চেঁচামেচিতে অপর্ণাদেবী, শর্মিলা, আকাশ ও আশেপাশের প্রতিবেশীরা সুইমিংপুলের কাছে জড়ো হল— সেদিন পুলিশ, রিপোর্টারের ভীড় হয়ে গিয়েছিল।

ঐদিনকার স্মৃতি শর্মিলা আর আকাশের মন থেকে আজও মুছে যায়নি। কেটে গেছে পনেরোটা বছর। আকাশরা ফ্ল্যাট পরিবর্তন করেছে। অপর্ণাদেবী মেয়ের শোকে তিনমাসের মধ্যেই মারা যান। কালকাতার প্রান্তে এক মানসিক শোধনাগারে চিকিৎসাধীন বিশ্বজিত। আজও তার ঘর থেকে আর্তনাদ ভেসে ওঠে—

"কি অসহ্য অন্ধকার, ঘড়িটাও দেখা যাচ্ছে না—।"

—হ্যালো, 'কিসমি'?

—বলছি।

—আপনাদের দোকান দুপুরে খোলা থাকছে তো?

—ইয়েস ম্যাম!

—ক'দিন আগে কেনা শাড়িটা চেঞ্জ করতে চাই। রঙটা—

—কবে কিনেছিলেন একটু বলবেন প্লিজ! 'কিসমি' কর্মীর সবিনয় আর্তি।

সামনে সোফায় উপেক্ষিত পড়ে আছে। কিসমি'র শাড়ি। বিধিসম্মত মাইক্রনের পলিথিন প্যাকেট। কেনার দিনের মতো নিভাঁজ শরীর। অক্ষত। আঁকিবুকিহীন। ভেতর থেকে ক্যাশমেমোটা বার করলেন হৈমী। চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার—গত মাসের দশ তারিখে কেনা...

—সরি ম্যাম! সাত দিনের মধ্যে না হলে...। আমাদের মেমোয় লেখা থাকে। একটু দেখবেন, প্লিজ!

—শুনুন...। ওপারের ব্যস্ততার আভাসে হৈমীর স্বরে ব্যগ্রতা ফুটল। উৎকণ্ঠাও হয়তো। কিন্তু ফোন কেটে দেবার শব্দ শুনলেন হৈমী।

অপছন্দের শাড়ি কোলে বসে থাকলেন খানিক। হতাশ ভঙ্গিমায়। তারপর শাড়ির ভাঁজ খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। চন্দন রঙ জমিনের পাশে মেরুন আঁচলা দেখা মাত্র চোখ আটকে ছিল। সামান্য খুলে নিজেই কাঁধে মেলে তাকিয়ে ছিলেন আয়নায়। খুশি হয়েছিলেন নিজেকে দেখে—এই বয়েসেও।

দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে বেড়াল কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক দৃষ্টির সামনে।

কীর্তিমান বেরিয়ে গেছেন একটু আগে, বাড়িতে হৈমী একেবারে একা। বছরখানেকের পুরনো চাকরির নতুন দায়িত্ব নিয়ে টিটো ব্যাঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে। তাঁর একমাত্র সন্তান।

কীর্তিমান আজ রাতে ফিরবেন না। হৈমী জানেন। তবু তাঁর বেরোবার মুখে তিনি নির্বাক ছিলেন। কীর্তির মুখেও কথা নেই। তাঁর বেরিয়ে যাওয়া নিঃশব্দে দেখলেন হৈমী। ভাষাহীন চোখে দাঁড়িয়ে থাকলেন সামান্য। তারপর দরজা বন্ধ করে উঠে এলেন।

হৈমী জানেন—কীর্তিমান ফিরবেন না আজ। কবে ফিরবেন—তা জানেন না। যেটুকু জানেন—ফ্লাইটের দু'টি টিকিটের ব্যর্থ আত্মগোপনের ফলে। দিন কয়েক আগে ওয়াড্রোবে কীর্তির পোশাকের ফাঁকে উঁকি দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন হৈমী।

কীর্তি এখন ভিন্ন খাঁচার পাখি। সে খাঁচার সঙ্গিনীও হৈমী নন।

গত মাসে আপিসের অধস্তন সহকর্মী জিজ্ঞাসা তালুকদারকে বিয়ে করেছেন কীর্তি। তাঁর

স্বামীর চেয়ে বিশ বছরের ছোটো নতুন সঙ্গিনী। অনেকদিনের পূর্বরাগের পরিণতি। কানাঘুষোয় শুনছেন ইদানীং। কীর্তির নতুন খরবটা জেনেছেন তাঁর বিয়ের দু'দিন পর। রিসেপশনের ছবি তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছেন কে—তা আজও হৈমীর কাছে রহস্যাবৃত।

তারপর থেকে হৈমী এখন শুধু ঝড়ের পাখি। কারও ফেলে যাওয়া খাঁচার।

শাড়িটার দিকে নজর পড়ল হৈমীর। মেরুন রঙের আঁচলে চোখ আটকালা। দোকানের চড়া আলোয় ভালো লেগেছিল রঙটা। এতখানি গাঢ়তা তাঁর পছন্দ নয়। প্রায় কালচে দেখাচ্ছে রঙটা। নাক চোখ ঠোঁট দাঁত গ্রীবা চুলে এখনও নজরকাড়া হলেও, তিনি তো তেমন গৌরী নন। সেজন্য অবশ্য তাঁর কোনোদিন আক্ষেপ ছিল না। এখনও নেই। আত্মবিশ্বাসে খামতি টের পাননি কখনও। এখন কিন্তু শাড়ির রঙের শেডটা হতাশ করল নতুন করে।

তিরিশ বছর পরে হনিমুনে যাচ্ছেন কীর্তি। সঙ্গে জিজ্ঞাসা নতুন সঙ্গিনী। হাঁটুর বয়েসী মেয়ে। হানিমুন! শব্দটা মনে পড়তেই অজান্তে ঠোঁটের কোণে মেঘ ভাঙ্গা রোদ্দুরের ভাঙ্গাচোরা ছবি ফুটে থাকল কিছুক্ষণ। বিষাদ আর বিদ্রুপের ঘনিষ্ঠ মিশেল।

তিরিশ বছর আগে হৈমী গিয়েছিলেন কীর্তির সঙ্গে। তাঁরা পুরীতে গিয়েছিলেন সেবার।

কীর্তিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন হৈমী। সেদিনের কীর্তি সত্যি ছিল। আজও কি মিথ্যে।

কীর্তির তিরিশ বছরের পুরনো খাঁচায় সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দ। সঙ্গে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। সুনামি নাকি! ঘরবাড়ি বিছানা বালিশ আসবাব ডুবে যাচ্ছে সব। তিনিও কি ডুবে যাচ্ছেন? তাঁর নাম ধরে ডাকছে কেউ। হৈমী শুনতে পাচ্ছেন। কালো পোশাক পরা কাউকে এক লহমায় দেখলেনও যেন। তারপর মিলিয়ে গেল ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে।

পরক্ষণে দেখলেন, শোকেসের ওপর টিটোর ছবিটা তাঁর দিকে তাকিয়ে দিব্যি হাসছে। কলেজ পড়ুয়া ছেলের মুখে দুষ্টুমি আর বুদ্ধির ছটা মাখামাখি। নিজের বিশ্বাসে টইটুম্বর। এখনও দিনে অন্তত একবার মা-কে ফোন না করে শুতে যায় না।

হৈমী যেতে পারেন। সর্বনাশ অথবা সম্ভাবনা যে কোনো দিকেই।

তিনি অনেক কিছু করতে পারেন। সব কিছু পারেন না।

শাড়িটা চোখের সামনেই পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে হৈমীর অবহেলা নিয়ে। নিছক অনিচ্ছায় তুলে নিলেন শাড়িটা। আলমারিতে রাখতে গিয়ে থমকালেন। মুহূর্তের জন্যে। কি ভাবলেন। আলমারি বন্ধ করে দিলেন। শাড়িটা রাখতে ইচ্ছে করলা না।

হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন নির্বাক। ভাবলেশহীন। কত অপছন্দ নিয়ে জীবনে বাঁচতে হয়।

পথিকৃত ■ প্রবীর সাহা

এক

"সুশীলা ওঠ ওঠ" মায়ের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে সুশীলার ঘুম ভাঙল, তখনও ভোর হয়নি। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। "তোর বাবা বাথরুমে পড়ে গেছেন"। সুশীলা ধড়মড় করে উঠে বসল, ভাবার কোন অবসর নেই। বাবা জ্ঞান হারিয়ে বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছেন। মায়েতে মেয়েতে কোন রকম ধরাধরি করে নিবারণবাবুকে চৌকিতে তুলল। একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। আজকাল প্রাইভেট চেম্বার খুলে ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানদের যুগ নেই। এখন পে-ক্লিনিক বা হাসপাতাল। পাড়ায় একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার থাকেন। তাকে পাওয়া গেল। সহৃদয় ব্যক্তি। জ্ঞান ফিরল। ডানপাটা নাড়াচাড়া করতে পারছেন না। উনি হাসপাতালে নিয়ে যাবার উপদেশ দিলেন।

সুশীলা মেয়েটা বেশ শান্ত। কোন মতে নিজেকে সটান রাখার প্রচেষ্টা। বি.এ.পার্ট ওয়ানের ছাত্রী, বাংলায় অনার্স। ছোট থেকে ডান পা'টা। খুঁত। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে ছোট থেকেই নাচের তালিম নেয়। নাচের শিক্ষিকা ওকে হতাশ না হতে নানাভাবে বোঝান। নৃত্যশিল্পী সুধা চন্দ্রনের জীবনী এবং তার প্রত্যাবর্তনের গল্প বলে ওকে উৎসাহ দেন।

নিবারণবাবু মধ্যবিত্ত। চাকুরী ভরসা। পৈত্রিক বাড়ী। যদিও ছোট। মা সুনীতা সংসার সামলান। কাজের লোক নেই। সাজসজ্জার বালাই নেই। স্বামী কন্যার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। লেখাপড়ায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেই দিকে নজর রাখেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সংসার, লেখা, পড়া, নাচ, সব আপন ছন্দে চলছিল। নিবারণবাবু কোনরকম নেশা করেন না। এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের সাহায্যে হাসপাতালে ভর্তি করা গেল। বেশ কিছু ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে সেগুলি বেশ দামী এবং দীর্ঘ দিন খেতে হবে। তিনি চাকরিতে যেতে পারছেন না। বেসরকারী অফিস অল্প অল্প টাকা দিতে লাগল—তাতে চিকিৎসা খরচ। সামলান গেলেও সংসার খরচে টান পড়ল। লেখাপড়া, কলেজ যাওয়া আসা, হাসপাতালে যাওয়া, নাচের টিউশানী এবং ছাত্রছাত্রী পড়ানো নিয়ে সুশীলার আর দম ফেলার ফুরসৎ নেই।

দুই

কেটে গেছে তিনটি বছর। বি.এ. ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেল, সুশীলা সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছে। ফেল যে করেনি এই অনেক ভাগ্য। সুশীলার দৃঢ় ইচ্ছা বাবাকে সুস্থ করে তোলা এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। লড়াই তাকে চালিয়ে যেতে হবে। ইচ্ছে থাকলেও এম.এ.-তে ভর্তি হবার চেষ্টায় গেল না। নাচের তালিম, টিউশানী এরই ফাঁকে ফাঁকে চাকুরীর দরখাস্ত দিয়ে চলেছে। সঙ্গে কম্পিউটার ক্লাস, এটুকু না জানলে আজকালকার দিনে চাকুরি পাওয়া মুশকিল। নিবারণবাবু কিছু সুস্থ হয়েছেন।

উঠে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারছেন—অনেকটা সুস্থ। কিন্তু বাংলা অনার্সের বি.এ. চাকুরী প্রার্থীর বিড়ম্বনা সীমাহীন।

অবশেষে, সল্টলেকের একটা অফিস থেকে কললেটার পেল। ইন্টারভিউ দেবার পর চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। কারণ তারা সেই দিনই প্রার্থীদের জানিয়ে দেবেন। লিস্ট টাঙাল রাত ৮ টায়। অবশেষে এত কষ্টের চেষ্টা সফল হল। তালিকায় তার নাম আছে এবং বলা হয়েছে যে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে তাদের বাড়ির ঠিকানায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার যাবে। বাইরে বেরিয়ে দেখল—প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়, জল। ছোট ছাতা, বাধা মানে না। যাইহোক, একটা বাস এসে দাঁড়াতে ও উঠে পড়ল। বিধি বাম, কিছুদূর যেতেই বাসটা ব্রেকডাউন হয়ে গেল। আর যাবে না। আবার রাস্তায়। একটু জল ধরেছে। হা পিত্যেশ, লোক গিজগিজ করছে। বাসের পাত্তা নেই। কিছু টাটা সুমো চলছে গড়িয়াহাটের দিকে যাবে বলছে। একটাতে সুযোগ পাওয়া গেল। গড়িয়াহাট এল। সব লোক নেমে গেল। তখন রাত প্রায় দশটা। অটো নেই বাস নেই। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল কোথায় যাবেন দিদি। আমি বেহালার ১৪নং-এ যাব। আপনি? আমি খিদিরপুর যাব পাশ থেকে এক যুবক জবাব দিল। আপনাদের দু'জনকেই পৌঁছে দেব। ১০ টাকা করে বেশি দিতে হবে।

সুশীলা ছাড়া আর একজন যুবক সহযাত্রী।

খিদিরপুর আসতে ছেলেটা কিন্তু নামল না। খিদিরপুরে নেমে গেলে মেয়েটা একদম একলা হয়ে যাবে। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে একটা মেয়ের জীবনে কী বিড়ম্বনা আসতে পারে সে'ত রোজ খবরের কাগজ আর টি.ভি. তে দেখেছে। তার আর নামা হোল না।

সুশীলার কিন্তু ভয় ভয় ভাব এসে গেল। মনটাকে বেঁধে ফেলল যা হোক হবে, সে নিজেকে সামলানোর জন্য তৈরি হতে থাকল—বাইরে বুঝতে দিল না।

আপনি নামবেন তো? —ড্রাইভার জিগ্যেস করল ছেলেটিকে।

চলুন, আমি পরে নামব।

সুশীলার মনে আরও জমাট ভয়। ১৪নং আসতে অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করল। সুশীলা নেমে পড়ল। ছেলেটি ড্রাইভারকে কি যেন বলছিল।

একটা আবেগ ভাসছিল ছেলেটা, দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে ছেলেটা একটা মেয়েকে নিরাপত্তা দিতে পেরেছে ভেবে আনন্দ পেল।

সুশীলা চাকুরীটার নিয়োগপত্র দুদিনের মাথাতেই পেয়ে গেল। প্রতিদিন সকাল ৮.৩০টায় বেরোতে হয়— ফিরতে ফিরতে রাত ৯টা। শনি/রবিবার দু'দিন ছুটি। ৯টার আগে থেকেই মা বারবার ঘড়ি দেখেন একবার ঘর একবার বাইরে দেখেন। সেও চেষ্টা করে সময়ে বাড়ি ঢুকতে, কিন্তু বাসের অবস্থা সব দিন সমান যায় না।

নিবারণবাবু ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে অফিসে যোগদান করেছেন। বাজারটা মুদিখানার জিনিস পত্র হালকা করে আনেন।

তিন

সুশীলার চাকুরী এক বছর হতে চলল। একদিন সন্ধ্যায় একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়েছে, বাসস্ট্যান্ডে দেখা হয়ে গেল সেই ছেলেটির সঙ্গে। সেই ইন্টারভিয়ের রাতের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার, সে বুঝতে পেরেছিল সেই দুর্দিনে তাকে নিরাপত্তা দিতেই ছেলেটি সেদিন বেহালা পর্যন্ত গিয়ে তারপর ফিরেছিল। ছেলেটির মুখটা মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল সুশীলার। এভাবে হঠাৎ দেখা হওয়ায় দু'জনেই দুজনকে চিনতে পেরেছে। সেই রাত্রের কথা তুলে সুশীলা তাকে ধন্যবাদ দিল। ছেলেটা হেসে ফেলল ওর চাকরীর খবরাখবর নিল জানা গেল তাদের অফিসের। একই বিল্ডিংএ ছেলেটার ১৫ তলায় আর সুশীলার ২ তলায়। ছেলেটি মোটর বাইকে আসে, আজ বাইক আনেনি। ভাগ্যিস আজ বাইক খারাপ হয়েছে, তাইতো দেখা হলো! বলল ছেলেটি, আমার নাম নজরুল,আপনার নাম?

সুশীলা— বলল সে।

এরপর প্রায় দিন ৭টায় সময় ছেলেটা বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'জনে এক সঙ্গে গড়িয়াহাটে যায়। সেখান থেকে সুশীলা অটো ধরে চলে যায় আবার কোন কোন দিন টালিগঞ্জের পাশ দিয়ে বেহালা চৌরাস্তা পেরিয়ে ১৪নং নামিয়ে দেয় ইতিমধ্যে নিবারণ বাবুর সে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা আর নেই। সুশীলার চাকুরীতে স্থিতি হতেই বাবার চাকুরী ছাড়তে বলল। তিনিও আর পেরে উঠছিলেন না। পাওনাগণ্ডা নিয়ে অফিস থেকে চলে এলেন। সমস্ত টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসে মাসে কিছু আয়ের বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

সুশীলার স্বপ্ন নাচ। এবার সে ধ্যান দিল নাচের তামিল নিতে। নাড়া বাঁধল নৃত্য শিল্পী মধুমিতা মৈত্রেয় কাছে। শনিবার ও রবিবার সকাল ৮টায়। শুরু হয়ে গেল তালিম সেই সাথে এপাড়া ও পাড়ার ফাংশনে, নৃত্য পরিবেশন। তার নিজেরও নাচের স্কুলটা ক্রমশ জমে উঠছে। তার ক্লাসে নজরুল অংশ নিল— তবলাবাদক হিসাবে। লেখাপড়ার ফাঁকে নজরুল ছোটবেলা থেকেই তবলাবাজান শিখেছে। নাড়া বেঁধে তবলাবাদক পণ্ডিত অনিরুদ্ধ মহারাজের কাছে তালিম নিয়েছে। আশ্চর্যভাবে দুই শিল্পীর যোগাযোগ। কখন যে কৃতজ্ঞতা এবং ভাললাগা পেরিয়ে দুটি হৃদয়া কাছাকাছি পৌঁছায় সেটা অজানা রয়ে গেল। আলাপের প্রথম দিনই নজরুলের নাম বলায় সুশীলা বুঝেনিয়েছিল তার ধর্ম। ক্রমশ জেনেছে নজরুলের বাবা সৈয়দ মুস্তাফা পেশায় বিজ্ঞান শিক্ষক। দিনখোলা ব্যক্তি। মা জাহানারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা। ঘর গেরস্থালী সামলান। একটি ছেলে একটি মেয়ে। সুশীলা নিমন্ত্রিত হলো মেয়ের বিয়েতে।

সেই ঝড়জলের রাতের পর এবং পারস্পরিক মন দেওয়া নেওয়ার ফাঁকে ওদের এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তির দিকে যেতে হবে—সেটাই ওরা ভাবছিল। আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো আর আইনক্সের শীতোষ্ণ হলে ঘনিষ্ট হয়ে ছবি দেখার পরে অতঃকিম? উভয়ের বাড়িতে প্রস্তাব দিল তাদের বিয়ের অনুমোদনের আশায়। কোন বাধা এল না।

উভয় পক্ষই রাজী। এরা সবাই উদারপন্থী। ধর্ম বিবাহের অন্তরায় হতে পারে না। বাধা এল দু'পক্ষের আত্মীয়দের কাছ থেকে। তাদের কে বোঝাবে? প্রথম সহায় নজরুলের বোন শবনম। সে তার স্বামীকে নিয়ে সুশীলার বাড়িতে ঘুরে গেল। অনেক আশ্বাস দিল, তার শ্বশুর ওদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু উভয় পক্ষে কিছু আত্মীয় বন্ধু আছেন যারা এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারছেন না আর বিরোধের বীজ তারা বুনেই চলেছে—যে ঘটনা কখনও ঘটেনি, যা সরাচরা ঘটতে পারে না তার বাইরে যাবার উপায় নাই। দুই ধর্ম একই মানবতার কথা বলে মানুষই শেষ কথা বলবে, ধর্ম নয় এই কথা তারা মানতে চায় না, কারণ কট্টরপন্থীদের হুকুম অমান্য হলে সমাজে আগুন জ্বলবে। কঠিন সিদ্ধান্তে আসার পরে তারা কিছুদিন অপেক্ষা করতে লাগল। যদি এই বিরোধ ঘুচে যায়।

ইতিমধ্যে সুশীলা চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে। নাচের স্কুলে পূর্ণ সময় অতিবাহিত করতে চায়। ভালই চলছে। এখানে অর্থাভাব নেই। ইতিমধ্যে মধ্যবয়সী এক পিছুটানহীন মহিলাকে পাওয়া গেল সংসারে দৈনন্দিন কাজে সাহায্যের জন্য। সংসার তরতরিয়ে এগিয়ে চলে। সুশীলার সংগ্রাম মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ইচ্ছে বাস্তব রূপ পেয়েছে। কিন্তু শেষ বাধা বিবাহের পূর্ণতা- সেটা বোধ হয় এ জন্মে কাটবে না। আল্লা বা ঈশ্বরের কি ইচ্ছে তাঁরাই জানেন। ঘৃণা এবং অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে বিরোধ, কিন্তু সুস্থ ভালবাসা সুন্দর বন্ধুত্বই সুস্থ সমাজ গড়ে তোলে। দুই পক্ষের শুভানুধ্যায়ী এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে ওরা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে রেজিস্ট্রী বিবাহ করে নিল। কাউকে ধর্মত্যাগ করতে হল না। এবং হিন্দু রীতি অনুযায়ী হোমাগ্নির সাক্ষী রেখে সুশীলার সিঁথি রাঙিয়ে দিল নজরুল। সৈয়দ সাহেবের স্কুলের সহকর্মীরা শবনমের শ্বশুর মহাশয় যিনি একজন মৌলবীও তিনি এবং তাঁদের কিছু আত্মীয়স্বজন, নজরুলের অফিস কলিগরা উপস্থিত থেকে বিবাহকে সমর্থন জানালেন। নিবারণবাবুও কয়েকজন আত্মীয়কে পাশে পেলেন।

কিছু বিরোধী জমায়েত সৃষ্টি হয়েছিল একটা। উত্তেজনা ছড়ানর চেষ্টা, কিন্তু বিফল করে দিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সুশীলা ও নজরুলের বন্ধুবান্ধবদের মোমবাতি মিছিল। যে মিছিলে ধীরে ধীরে বেশ কিছু মানুষ যোগ দিল, পুলিশ অত্যন্ত সংযতভাবে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

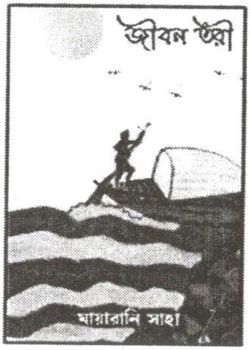
ঝড় উঠেছিল, ঝড় থেমে গেছে। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী অনেক এগিয়েছে মানুষ মঙ্গল জয়ের সময় গুনছে—আজকের ধর্মবোধ এগিয়ে নিয়ে যাবে মানবধর্মকে। মানবতাবোধ আজকে জেগে উঠবেই—সে লড়াইয়ের পথিকৃত সুশীলা এবং নজরুলেরা।



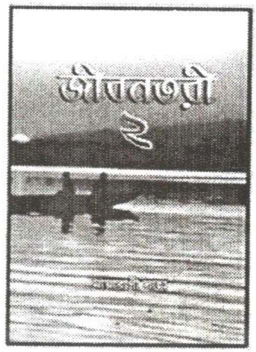
স্কেচ - শিবাদিত্য রায়

কবি মায়ারানি সাহা এর

কাব্যগ্রন্থ



জীবন তরী
ও
জীবন তরী ২



কিছু কথা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন সংগ্রামে নদী যেন সহযোদ্ধা, প্রণয়ী, বা প্রণয়িনী, প্রাণসখা, বা সুজন ।তার জলধারার শব্দে যেন জীবনের কলোচ্ছাস । সে নদীরসঙ্গে আশ্লিষ্টজনের ভাবনায় নদী তার গ্রামজ সংস্কৃতির সহচর হয়ে মিলেমিশে আছে । তাকে নিয়ে কত ভাটিয়ালী, কত ভাওয়াইয়া, কত রঙ্গরস, কত মান অভিমান ।লেখকের কলমেও নদী তাই জীবনের সাযুজ্যে । নিত্য তার সঙ্গে হৃদয়ের সহবাস । সেখানে উথলায় ঢেউ।আর তখন মরমী কবির আত্মনিবেদনের অনুপ্রেরণা । কবিতায় কবিতায় ভরে ওঠে খাতার পাতা । আত্মজনদের কাছে পৌছাক সে কবিতা ।

অন্তহীন প্রকাশনী
১৩৭এ, বি ব্লক,
সোনালী পার্ক, বাঁশদ্রোণী
কোলকাতা ৭০০০৭০

বঙ্গদর্পণ
ঘাসিয়াড়া, সোনারপুর
কোলকাতা ৭০০০৫৩

সুখদুঃখপ্রেম ■ অনন্ত দাশ

সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী নিঃসাড়ে সে আসে
স্নায়ুতন্ত্রে ঢেউ তোলে জীবনে তুফান
দৃষ্টির ভিতরে চলে অলৌকিক যান
সর্বদাই যেন এক অনুরাগ ভাসে

দুঃখ কেন ক্ষণস্থায়ী ধমনীর স্রোতে
অবিরত ভেসে থেকে রাখে টানটান
গরল যে পান করে সেই শুধু জানে
কীভাবে জীবন হয় ছত্রখান

জীবনে যখন প্রেম আসে ততক্ষণ
সত্তার সঙ্গীতে বাজে অহরহ গান
পৃথিবীর সব কিছু ভুলে যায় মন
প্রেমের যন্ত্রণা তাই থাকে চিরকাল
সুখদুঃখপ্রেম নিয়ে এইতো জীবন
এই আছে এই নেই মানেনা শাসন



একটি পালক কথা ■ শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

একটি পালক যত্নে ছিল,
বুকের ভেতর আগলে ছিল
প্রথম প্রেমের লাজুক নিদর্শন...

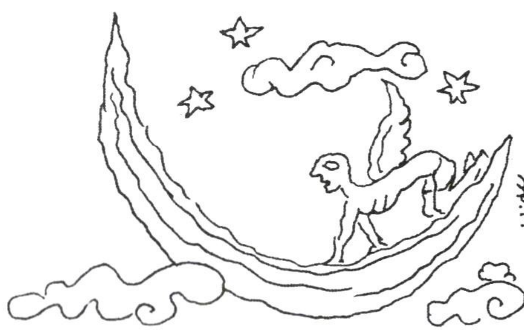
পালকটা যেই উড়িয়ে দিলাম
আপন খেয়ালে, বসন্তরঙে,
আকাশের গায়ে আঁকছিল কত রঙ।

উড়তে-উড়তে, ভাসতে-ভাসতে
কোন আলোছায়া মাখতে মাখতে
কোথায় গেল?
আমি তো হিসেব রাখিনি...

ওড়াবার আগে পালকের গায়ে
সাজিয়ে দিয়েছি সুখ বৈভব, আদুরে, বিলাসী
আলোমাখা সব আমার যাপনছবি।

হঠাৎ দেখি, ফিরেছে পালক, তার গায়ে আঁকা
কৃষকের ঋণ, বিপন্ন শিশু, বিষণ্ণ দিন,
খরা-বন্যায়, অনাহারে মৃত
বহু মানুষের দীর্ঘশ্বাসের ছবি...

মুছে গ্যাছে তার বসন্ত রঙ, ভাসেনা হাওয়ায়,
পাঁসুটে বর্ণ পালকের গায়ে বিঁধে আছে ব্যথা,
আজও তা মোছাতে পারিনি।



মুখোশ ■ দীনেশ দে



দোকানের কাঁচের শো-কেস
কত রকমের মুখোশ
সেখানে। কত প্রাচীন দেব-দেবী
জন্তু-জানোয়ার।

কি হবে নতুন করে মুখোশ পরে?
মুখোশ তো আমরা পরেই আছি অজান্তে—

মনের জান্তব হিংসা রাগ লোভ লুকিয়ে
সারাদিন মিথ্যে হাসি-কান্নার মধ্যে দিয়ে
পাকা মঞ্চাভিনেতার মতো
জীবনের নাটকে পৃথিবীর রঙ্গালয়ে
পোশাক-আশাকের আড়ালে ভালমানুষের অভিনয়ে।

আত্ম-পরিচয় ■ রঞ্জিত কুমার ভরদ্বাজ

নিজেকে নিজেই স্পষ্ট চিনে নিতে হয়,
নইলে মাঝপথে বিকল গাড়ির মতই
গুরুভার হয়ে ওঠে দ্বান্দ্বিক সংশয়ে
বিশ্বাস, অভ্যাস, চেতনা, নিত্য-অপ্রত্যয়;

যেমন কতটা খোশবু, পেলবতা আছে
গ্লিসারিন সাবানের স্বচ্ছতার গভীরে
তা জানা থাকা চাই;
নিজের দু-পিঠ দেখ ডবল আরশিতে সাজ-ঘরে
চটকের আড়ালের খুঁতগুলি চেনো ছায়াহীন
জন্মদাগ মেনে ছাঁটো বেহিসেবী বড়াই
নয়তো খোলামেলা ক্রুচেট সুতোর দশা হয়
হামেশাই জট বাঁধে বাহিরে-অন্দরে
বুদ্ধি, বিবেক, প্রত্যাশা, জয়, পরাজয়।



স্বপ্নসুর ■ সুকুমার সাহা

অতীত তুমি তোমার মতো
কখনো আলো দাও কখনো বা অন্ধকার
কখনো রাঙিয়ে দাও পলাশ রঙে
কখনও বা বিষাদ বিছিয়ে কথা বল
নিষ্ঠুর নির্মম অনাবিল প্রত্যয়ে
নিয়ত ঋদ্ধ কর শুদ্ধ কর
স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে, গোলাপসুবাস ছড়িয়ে
অতীত তুমি তোমার মতো
ভালবাসি তোমাকে, তোমার মতো করে

অতীত তুমি তোমার মত
ভালো ও মন্দে স্মৃতিকে সজাগ করে দাও
অভিজ্ঞতাগুলো বেছে নিতে বলো
সাজিয়ে নিতে বলো
কখনও বা বৃষ্টি নামাও উঠান জুড়ে
শিউলিগাছে শিমুলগাছে
স্বপ্ন সুরে। সকাল রবি
পুবের আকাশ রাঙিয়ে
সামনে চলার মন্ত্রণা দেয়...
যন্ত্রণা সব ভুলিয়ে, অতীত
নিয়ত আরশি করে তোলো।

অতীত তুমি তো জানো
তোমাকে সাথে নিয়েই
গান গাই, পা তুলি পা ফেলি
আমি আমার সংজ্ঞা গড়ে তুলি
সজ্ঞায়িত হই সবাকার মরমী মননে
ভালো বা মন্দে
পায়ে পায় পথ সরে যায়
মানো বা না মানো, আমি মানি
তুমি কি কখনো হতে পার অভিমানি?

তোমার কোল জুড়ে খেলা করে
নতুন নতুন বিবসনা অতীত
দেখি, দুচোখ ভরে,
অতীত, সে আনন্দ
আমার, তোমাকে দিলাম
এ আমার দুর্মূল্য প্রণামী!



ইচ্ছা ■ তীর্থঙ্কর সুমিত

কিছু কিছু ইচ্ছা শুধু ইচ্ছাতেই থেকে যায়
হাত মুঠো করলেও
বিন্দুকে ধরা যায়না
বড় বেমানান শরীর
কখন যে হাত ছুঁয়ে, পা ছুঁয়ে
চোখের সামনে ইতিবৃত্ত তুলে ধরে
আর ক্ষণিকের স্পন্দন
কি বেঁচে থাকার মুহূর্ত

হারিয়ে যায় কারোর ডায়েরির পাতায়
কিংবা কারোর ছেঁড়া ঠোঙায়।

দ্রৌপদী ■ বিনয় লাহা

চারজন যুবক মিলে মেয়েটির ঠোঁট স্পর্শ করার আপ্রাণ চেষ্টা করল।
প্রথমত ভালবাসা ছড়িয়ে দেবার কিছু ছিল না।
মেয়েটি কাত হয়ে উগরে দিচ্ছিল ঘৃণা
তেত্রিশ কোটি দেবতা আমি তাদের পরোয়া করিনা।
চাইলেই মেয়েটি এলিয়ে দিতে পারত
হাত, চিবুক, শোভা উরু, জঙ্ঘা, মোম।
স্তনে স্তনে বিছিয়ে দিতে পারত পৃথিবীর লালসা
যা কিনা জড়ো হয়ে ছিল মেয়েটির ঠোঁটে।
চারজন যুবক মিলে ঘৃণাক্ষরে ছুঁতে পারেনি কাম।
কিছু কিছু রহস্য দানা বাঁধে কার্যত বিকল ও পচে যাওয়া পুরুষতন্ত্রে
একমাত্র অর্জুন সেরাত্রে ঘুমাতে পারেনি।



আলোয় ফেরা ■ তাপসী লাহা

আজ কতকটা মেঘের মত সাজতে চায় মন।
ফুল নামের কোমল জীবন ছুঁলে
পাতায় পাতায় ঝরে যায় বর্তমান।
আবার খানিক বালিকাবেলায় চুমুক।
কোল খালি থাকলে সেখানে দু একটা বিল্লির আনাগোনা,
ছোট চুলে অভ্যস্ত আড়ষ্টতায় ফ্রেম হয়ে থাকা কিছুক্ষণের মিষ্টি মুহূর্তরা।
রাত বাড়লে মায়ের ডাক, 'খেতে আয়।'
মা কিভাবে জানতো, সত্যি কত ক্ষিদের কামড়।
গুরুগর্জনে আজ সে ক্ষুধারা মেঘের অবয়বে হিল্লোল ছড়িয়ে কেড়ে নিচ্ছে
সংবৃত আকাশের ঘুম।
পাথর বুকে আছড়ে এক বঞ্চিতার ধুমায়িত অভিমানের শেকড় খুবলে নেবে
স্থির, সৌম্যসত্যের কিছু অবশেষ
নিষ্পেষণের ভাঁড়ারে চেপে যাওয়া অন্ধচক্ষুর যবনিকা
সরিয়ে নিয়ে আসবে দিনের আলোয়।

শ্রাবণ ■ শাশ্বতী গোস্বামী

জল থৈ থৈ শ্রাবণ
তোকে বড্ড ভালোবাসি
জীবন নামের ছোট্ট ঝিলে
রঙ্গীন নাও এ ভাসি।

তোর আশাতে বছর ভরে
চাতক হয়ে থাকি,
আমার প্রিয়ার মান এর মতো
দুরন্ত বৈশাখী।

চোখ ছলছল বন্যা কবল
মুখভার তোর মতো
বুকের আঁচল মুক্তধারায়
ভেজায় অবিরত।

কান্না শুষে ঠোঁটের পাতা
শান্ত অবিকল ,
এই মেয়ে! তুই ভিজবি আবার?
আমার সাথে চল
তোর আঁচলে দুঃখ রেখে
বিশ্ব ভুলি রোজ
শ্রাবণ এলেই তোর চোখেতে
ভালোবাসার খোঁজ।।





অভিমানী নদী ■ কিশলয় গুপ্ত

অভিমানী নদী; সরে গেছে দূরে
ঠায় একা বসে শান বাঁধা ঘাট
চোরাবালি ঘর বসে হাঁটু মুড়ে
সামলায় হাতে গোটা রাজপাট

জল গেছে চুরি; অভিমানী নদী
ভিনদেশী তার যুবতী নগর
প্রশ্নের ভীড়ে উঠে আসে যদি
প্রাগৈতিহাসিক ঘুমন্ত শহর।

অভিমানী নদী; দুরন্ত সে স্রোত
গড়ানো সময়ে মৃত চৌকাঠ
পাড় ভাঙা গাছে একলা কপোত
সরেছে নদী আছে শানবাঁধা ঘাট।

কৃষ্ণ বাসুদেব হয়েছিল ■ চৈতালী রায়

কৃষ্ণ চেয়েছিল বাসুদেব হতে।
তোমার আমার মত সাধারণ মানুষের কাছে।

আর কি কি দেবার ছিল পাতে
সে কথা তো ইতিহাস বলবে।

রংচটা বাড়িটাতে থাবা মেরে বসে আছে
পুরোনো, বাসি, ভেপে ওঠা সংস্কারগুলো
দহন নাকি শুধু আগুনেই হয়!
কৈবর্তের ফেলা জালে গুগলি, শামুকের সাথে
শ্যাওলাও উঠে আসে
এ সত্য কথাটা বলা নেই তাতে
কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে,
মাথায় সিঁদুর, হাতে ছোটো ছেলে নিয়ে
আদুরী ফিরেছে পুরনো বাড়িতে।
ফুরিয়ে ফেলা গোটা দশটা বছর
এখনও পুড়ছে ওর মনের ভেতর।
জ্বলন্ত গনগনে আগুনের শিখায়
গড়ে তোলা নিটোল বুননের বাড়িটা ভস্মীভূত।
কে বলে—আগুন ছাড়া দহন হয় না!

কৃষ্ণ তো সংস্কারের বশেই
একদিন ঠিক বাসুদেব হয়েছিল



যন্ত্রণা ■ হিমাংশু দাস

যন্ত্রণা
বইবার জন্য পুরুষ!

কাপুরুষ কোথাকার!
এতোগুলো দিন কেটে গেল
স্বপ্নের পাহাড়ে
হৃদ-শয্যায়....তুমি ছিলে
আমার...

আমি কখনো ভাবিনি তুমি
এ কথা...
আমি নারী নই

শুধু তোমার মনে নেই ■ চঞ্চল রায়

এই আলো বাতাস সবাই জানে
এই সবুজ বন বৃক্ষ লতা ফুল ফল,
ঐ যে দূর দিগন্তে নীল আকাশটাও
মনে রাখে, শুধু তোমার মনে নেই।
রাস্তার সেই ফুলের গাছটাও জানে
তোমার আমার চিরন্তন প্রেমের কথা
কত বকুল ফুল দিয়েছিল তোমাকে
আর তুমি মালা গেঁথে দিতে আমায়।
নদীর ধারে বট গাছটি এখনো আছে
পাতারা নিরবে আমাদের কথা কয়,
আমাদের প্রেমের কথাগুলো ভাসছে
দিন-রাত্রি জানে, শুধু তোমার মনে নেই
ঐ যে সাগরের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার
বালিতে লেখা তোমার নাম— ঢেউ জানে
পাখিরাও চুপি ডালে বসে দেখেছিল
চুমুর সেই মিষ্ট গোপন দৃশ্য।
ঐ যে পাহাড়ে পাথরের গায়ে লেখা নাম
এখনও অনেক উজ্জ্বল হয়ে আছে,
ঐ পাহাড়ের ঝর্ণাও জানিয়ে দেয়
মনে আছে শুধু তোমার মনে নেই।





শান্তি উধাও ■ সুপ্রিয়া চক্রবর্তী

বারান্দায় বসে দেখি,
বাস, ট্রাম, মানুষের সারি
কোলাহল জ্যামজট
মুটের মাথায় বোঝা ভারি

পথে পথে মিছিল আর
অগুনতি মানুষের ভিড়
পতাকা সবার হাতে
মুখে মুখে স্লোগান গভীর।

রাস্তায় খুনোখুনি দিনে রাতে
মারামারি মানুষে মানুষে
কখন বেপরোয়া গাড়ি
দিয়েছে মানুষকে পিষে।

শান্তি খুঁজতে গেলে
দূরবীনও হয়েছে যে কানা
টেলিস্কোপেতে চোখ দিয়ে লাজ
গ্রহদের মত খুঁজি শান্তির দানা।

আনন্দ অমূল্য হয়েছে বুঝি
মূল্য দিয়ে আনন্দ হাতড়াই
তবুও আনন্দ যেন হাউই বাজি
ইউজ এ্যান্ড থ্রো সবটাই।

অন্য আমি ■ ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানিং সবকিছুতেই প্রবল অনীহা আমার
গান শুনিনা, কবিতাও লিখিনা
দেশপ্রেমের স্মৃতিকাতরতা আমাকে আক্রান্ত করেনা
দিনগুলোকে চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে স্মৃতির জাবর কেটে দিনযাপন করি
এমনটা আগেও হত!
মাঝে মাঝেই এমনটা হতে দেখে একদিন মৌমিনা বলেছিল
একদিন তুমি একা হয়ে যাবে
তোমার আসে পাশে কেউ থাকবেনা
তোমার ঘরের দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের পাতা জুড়ে রাত্রিরা জীবন্ত হয়ে উঠবে
ঠিকই বলেছিল মৌমিনা
আমার এমন অনীহা আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে একটা অন্ধকারের মধ্যে
যেখানে ভোরবেলায় পাখির গান শুনতে পাওয়া যায়না
গ্রীষ্মের দিনগুলোতে কেউ বেলের সরবৎ বাড়িয়ে দেয়না
শ্রাবণ এলে ইলিশের মত রূপালী হয়ে ওঠেনা দিনগুলো
শরতের নীল আকাশে ধোঁয়ার মত মেঘেদের জমে থাকতে দেখিনা
শীতের মত শীত আসে না
পাকা ধানের মাথা দুলে ওঠেনা
পিঠে-পুলির ঘ্রাণ পাওয়া যায় না
আর এইসব না হওয়ার জন্য আমিও মৌমিনার কথামত
নির্জন বন্দরে হারিয়ে গিয়েছি অনীহার গহীন সমুদ্র।



অপেক্ষা ■ কুনাল গোস্বামী

ঐ রাস্তায় কান পেতে আর শোনা যায় না সেই চেনা নুপূরের শব্দ
কালো-কালো মেঘেরা ঝোড়ো হাওয়ায় সাথে দিয়েছে পাড়ি ভিনদেশে

এখানে এখন শুধু দমবন্ধ হওয়া নিস্তব্ধতা
একাকীত্বে জর্জরিত কিছু অসমাপ্ত কবিতা
আর সেইসব কবিতায় বেশকিছু বাস্তবিক চরিত্র
এখনও বাঁচার চেষ্টায় মাটি ফুঁড়ে দু'হাত বার করে থাকে
না জানি কিসের অপেক্ষায়!

অসামাজিক ■ রিয়া ভট্টাচার্য

আমি বন্ধন মাঝে করে বেড়াই মুক্তি অনুসন্ধান
মানবের মাঝে খুঁজে বেড়াই ঈশ্বর...
নিরাকার নিরর্থক ভাবনার মাঝে;
গড়ে তুলি মনন বসতি,
দমকা ঝড় ভেঙে দিয়ে যায় বারবার।
সম্পর্কসুতো জড়িয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধি আপনাকে
ঘোলা সামাজিকতার জলে ভাবনার বৈঠা বেয়ে চলি,
আঘাত করে যায় সময়ের জঞ্জালকণা
আছড়ে ফেলে বন্ধ্যা আবেগের তীরে,
চূর্ণবিচূর্ণ আপন শবের দিকে চেয়ে...
আমি তখন খিলখিলিয়ে হাসি,
ভণ্ড নিয়মের বেড়াজাল মাড়িয়ে হাঁটি নির্লিপ্ততায়
ছুঁড়ে দিই মুঠো মুঠো ক্লেদ...
সমাজবোদ্ধার সফেন চাদর লক্ষ করে,
কলঙ্ক আঁকড়ে ডুবে যাই অনাচারে।
বাউণ্ডুলেবেশে ট্রামলাইন ধরে হেঁটে যাই,
করতে যাই না জাতপাত উঁচুনিচুর হিসেব,
রক্ত আখরে অমর করে যাই অসম ভালোবাসা,
চেনা ছন্দের ছদ্ম গণ্ডি উল্টে—
অনিয়মের ইস্তেহারে ঢাকি ডাইরির পাতা,
তোমরা আমায় অসামাজিক বলতে পারো;
বেনিয়মি দৃঢ়তায় উপেক্ষা করে যাই শত নিয়মের খতিয়ান।



আকাঙ্খা ■ দীপক পৈতণ্ডী

না পাওয়া হতাশা দেয় না,
এখন আমি ছেঁড়া রুমালে মুখ মুছি,
বিছানায় ছারপোকা কামড়ালেও
অস্বস্তি ও ব্যথা অনুভব হয় না।
কিন্তু কোথাও মনের মণিকোঠার
গোপন স্থানে অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা
সমস্ত আনন্দকে গ্রাস করে।

ছায়াপথ ■ শম্পা চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ ভেজা গন্ধ মেখে সোনা রোদ্দুর
খেলা করে, পাকা ধান ভিজে আলপথ বেয়ে,
এক আঁচল সবুজ তার দুই প্রান্ত জুড়ে,
টুকরো টুকরো বৃষ্টির জমা জলে জন্ম নেয়।
শত ছেঁড়া ছেঁড়া আকাশ, রূপালী ছোঁয়ায় মিশে।
তারই গহনে চুপ করে বসে নিরালা বক।
মাটির রাস্তা মাটির বাড়ি,
কাঁচা রাস্তার পাড়ে তাল সারি সারি।
যতবার ফেলে আসি গ্রামখানি পিছে,
এক আপাত দাবি জড়ায় আমাকে বলে, আবার
আসবেতো ফিরে?

মিছিলের শহর রঙ বদলায় রঙ বিচরণের!
তবু হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়ে ডাক নাম,
আমার সেই ক্ষণজন্মা জাতিস্মরে।
মাটির রাস্তা মাটির গ্রাম
নদীর চরাচরে শুকনো অশ্রু তার।
অশ্রুত সুর, গীতবিতান, পুরোন হারমোনিয়াম।
পিছুটান ডাকে আমায়, আমার চেনা মুখ।

বদলা বদলি ■ সৌরভ ঘোষ



আমি পাল্টে ফেলি
জামা-কাপড়, হাতঘড়ি, ফুলদানির ফুল।

তুমিও বাসা বদলাও
জলাশয়, সঙ্গী....

বহুমুখী হরিণী না কুকুর কি বলি...!

পিচকারি টিপলেই রঙ, দূরে দূরে হোলি
থুতু চেটে চেটে খায়, গেঁজে ওঠা যোনি...

কুড়িয়ে আনি বৈদুর্য মণি ■ বুদ্ধদেব ঘোষ

তোমার মুখোশের আড়ালে
ভয়ংকর মুখ,
ভয়ে গৃহস্থের শঙ্কিত
স্বপ্নও তন্দ্রাচ্ছন্ন

প্রতিবাদের ভাষা আজ
ভূগর্ভস্থ জলের মতো
নেমে যাচ্ছে পাতালে

বাসন্তিক প্রতিভা এখন
দাবদাহের শুকনো কাঠ,
তবুও জ্বলে ওঠেনা
প্রতিবাদের আগুন
সেখানেও তোমার মুখোশের
আড়ালে ভয়ঙ্কর মুখ।

আয় কিশোর আয় যুবক
আতঙ্কের পাহাড় ডিঙিয়ে
কুড়িয়ে আনি বৈদুর্য মণি।





ভালোবাসাতে ফিরে এলাম ■ মিঠু ভট্টাচার্য

আমি মুঠোয় আকাশ ধরতে পারি
তোমায় ভালবেসে,
গরল কিম্বা সুধা পান করতে পারি
অনায়াসে, তোমায় ভালবেসে।
তোমায় খুঁজতে যাই যে দূরে দূরে
সাগর পাহাড় ঘুরে ঘুরে,
ফুল হয়ে তো বুকেই আছি –
বললে তুমি হেসে ... ভালবেসে
ভালবেসে।

জন্মভূমি ■ স্বপন কুমার মান্না

দেশ যে সবার জন্মভূমি, দেশ যে সবার মা
দেশের জন্য মরণ বরণ দুঃখ থাকে না।
বুলেট, গোলা ডরায় কে বা মান বাঁচাতে দেশ
রক্ত দিয়েও শত্রু নিধন করবে ঠিকই শেষ।

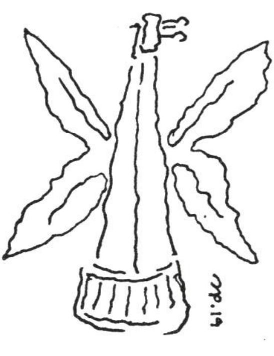
বীর শহিদের রক্তেলেখা এদেশ স্বর্গভূমি
স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ তাঁদের চরণ চুমি,
জীবন দিয়ে আনলো যারা দেশ জননীর মান
সব হৃদয়েই থাকবে আঁকা তাদের অমর দান।
এদেশ আমার, এদেশ তোমার, এদেশ সবার ভাই
সব দেশেরই সেরা এদেশ, বাসবো ভালো তাই।
আজকে যদি থাকতো বেঁচে বীর শহিদের দল
স্বার্থে গড়া এদেশ দেখে ঝরতো চোখের জল।

আজকে তাঁদের স্বপ্নগুলো হারায় মরুরতটে
আছে কেবল অমর হয়ে ছবি আঁকা পটে।
মানবতার মরণ দেখে হাসছে তাঁরা জানি
কে বা আছে সেই গুণীজন শান্তি দেবে আনি।

অন্য তুমি ■ অভিজিৎ মান্না

ভেঙে চলতে হয় যন্ত্রণা বারংবার।
আলগা হয় মনঘরের আলপনা।
প্রবঞ্চনার গলুই ভেঙে ভেঙে
বসে থাকা জীবন পাড়ে।
উত্তর খোঁজা উত্তুরে হাওয়ায়।
অবক্ষয় গুনে বয়স বাড়ে।
এত কোলাহল তবু থমকে আছে পদক্ষেপ।
ভিতর থেকে নড়ে ওঠা দেওয়ালে লাগে বাসি দুর্গন্ধ

নিচু হয়ে গ্রহণ করার সামনে যে আগুন চোখ
আগাছা আর অনুভূতিহীন ভ্রুভঙ্গী।



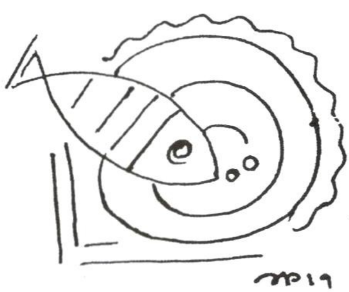
আবিষ্কার ■ সূর্যস্বপন ঘোষ

একবার আকাশ ছুঁয়ে দেখো
হৃদয়ের গভীরে অনন্ত নীল অসীম অনুভূতি
তোমার চাওয়া পাওয়ার ভাঁড়ারের তালা খুলে বাইরে এসো, স্বপ্ন ঝেড়ে
ঘুম ভেঙ্গে ওঠো,
বাস্তবের মাটিতে হাত রাখো।

সমস্যার লৌহকপাটে সজোরে আঘাত হানো।
চতুর্দিকে সময়ের ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে চলেছে ব্যস্ততা।

দুনিয়ার দশদিক দশ আঙ্গুলে নাচিয়ে তোলো,
পৃথিবীর সীমারেখা পার হতে তোমার সময় লাগবে মাত্র কয়েক মুহূর্ত।
অকৃপণ আবেদনে দুনিয়ার সব ইচ্ছা তোমার হাত ব্যাগে বেমালুম জমা রাখো।
হৃদয়ে জমে থাকা ছবি,
মনের এলবামে সাজাও একে একে,
মনের আয়নায় নিজেকে আবিষ্কার করো।

কোনো এক বর্ষা মুখর রাতে
প্রেমিকার বাহুপাশে নিজেকে আবদ্ধ করো।
প্রেম কিংবা জীবন, অস্তিত্ব কিংবা চেতনা, তোমাকে ঘিরে থাকুক।



ছায়াপথের ছায়ায় ঘুরছি ■ নিজামুদ্দিন মণ্ডল

ছায়া পথের ছায়ায় ঘুরছি ঘুমের ভেতর হারিয়ে যায় এভাবেই প্রতিনিয়ত ঘূর্ণনচক্র
রাত্রি এসে গলা ধরে কাঁদে তারারা এসে নিভে যায় নক্ষত্রদের
ডেকে এনে কাছে বসাই আঁধারের স্বপ্ন দেখি চারিদিকে শুধু ব্ল্যাকহোল
ছায়াপথের ছায়ায় ঘুরছি এক একটা বিস্ফোরণে অন্ধকার সমাজ তালি দিচ্ছে।...

অশ্রুত ■ রাখী সরদার

যা শোনা যায়না এমন
বেদবিরুদ্ধ গল্প শোনো।

আমাদের একটা বাড়ি ছিল
কর্কটক্রান্তি রেখা ঘেঁষে
এক টুকরো নষ্ট বারান্দা,
আর দুজনের মাঝে আদিম আদর স্রোত

একদিন স্রোতের টানে
ভেসে আসে এক মৃগ....পিছু নেয় আততায়ী...

বাড়িটি আর নেই,
সেখানে ঘুমিয়ে আছে পাষাণ কবর
জীবিত কবর আর এক খোঁড়া হয় রোজ
অলক্ষ্য মাটির ঢেউ সমাধি বোজায়

তথাবধি সেখানে কাফনে মুখ ঢেকে
ঘুরে বেড়ায় সোমত্ত জীন





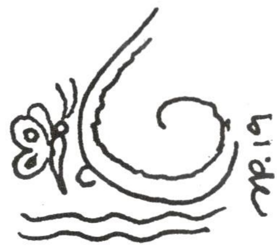
সীমানা ■ কার্তিক মণ্ডল

মাথা উঁচু দাঁড়িয়ে সীমানা
লতাপাতা জড়ানো বাসর
বিচ্ছিন্ন স্বজন নিয়ে গুমোট সংসার
মুখে ঠোঁটে চাপা শব্দ
শুকনো হৃদয়
বিবেকের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত
নিঃশ্বাসে ওম
বুকের পাঁজর ঘূণ পোকা কুরে কুরে খায়
তবুও নিরুপায়।

আগুন ■ ফটিক চৌধুরী

আগুন নিয়ে খেলা করো তুমি? এতে কি পাবে?
শুধু ছাই ভস্ম পাবে। ছাই ভস্ম দূর্গা ভালবাসে
তুমি কি শিবের পূজারী? বলা ভালো পূজারিণী।

এখন চারিদিকে আগুন, দাউ দাউ, এরকম এক
সূর্য্যের খরতাপে পুড়ছি আমরা সবাই, এ খবর রাখো!
তেমন জল কই এ আগুন নেভাবে। একদিন আগুনই
সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, আবার এখন মৃত্যু ডেকে আনে!
আসলে আগুন নিজেই পুড়ে খাক হয়ে গেছে, সে
শুধু অপেক্ষায় আছে কখন কি রূপ ধারণ করলে
এ সমাজ বাঁচে। উত্তাপ নিয়ে বাঁচাই তো জীবন।



কলসির অন্ধকারে বসে ■ সজল কুমার টিকাদার

হৃদয় ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

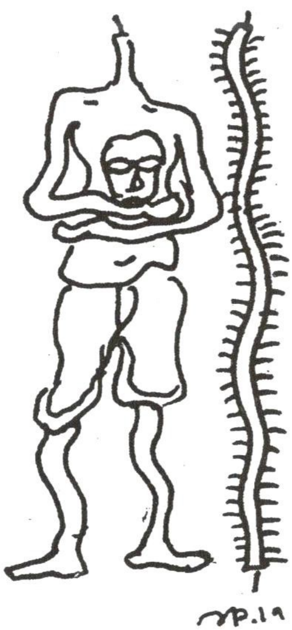
এখানে কি কোন নতুন নির্মাণ হবে?
তবে মালমশলার আয়োজন কোথায়?
না কি শূন্যতায় তুলবে প্রাসাদ?

কেন তবে অবসাদ।
কেন এই অবসাদ?
ঝলমলে আকাশটুকু কে টেনে নেয়
অন্ধকার আঁচল তলে?
কে ছেঁকে নেয় সব কাকলি
আজ এ প্রবাহ জলে?
শুধু ঠক ঠক ভাঙার আওয়াজ শুনি
আর কলসির অন্ধকারে বসে বসে
সারাক্ষণ আলোর দিন গুনি।

অকারণে ■ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী

বারুদের শিল্পই এখন একমাত্র ভরসা রোজগারের
বিনা নিমন্ত্রণেই ভালোবাসায় ভাগ বসাতে চেয়েছি
প্রতিকূলে থাকার মত মেরুদণ্ড নেই আমার
ভিন্ন প্রেমের স্বাদ বুঝতে,
রাস্তার ধারে সিগন্যালে গোলাপের কাঁটা হয়ে ফুটেছি,
আদর করে ঘরে তোলেনি, পোকা মাকড়ের মত ঝেড়ে ফেলেছে।
ইশারার যাতায়াতে আপত্তি ছিল ছোটো থেকেই,
জোর ধাক্কা লাগল অস্থির নোঙরে।
ওদিকে পাখিরা অন্য পথে হাঁটা দিয়েছে,
কিচিরমিচির বন্ধ করে
ভেজা ঘামের চিঠিগুলো তুলে রেখো আলাদা করে,
ওগুলো এখনও শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।
বাস্তবের চাবিকাঠি স্মৃতিপথ আটকালে,
মেঠোপথে পায়ের ছাপ মিলিয়ে রেখেছি পরিচিত অভ্যাসের ছায়াপথে।

বার্ধক্যের অনুভূতি ■ প্রদীপ কুমার সামন্ত



এই বেশ ভালো আছি, বেশ আছি
অজস্র চিন্তার ঢেউ নেই, কেউ নেই।

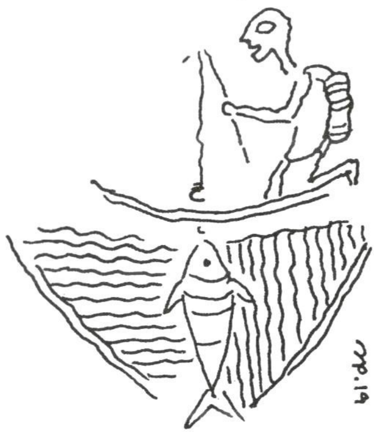
নীরব যন্ত্রণা বুকেতে কাঁদে না
এলোমেলো স্বপ্ন চোখে ভাসে না
রঙিন বসন্তের মধুমাসে পলাশের আভায়
মন রাঙে না
উষ্ণতার ছোঁয়ায়, শরীরী খেলায়
স্নিগ্ধ হয় না অবুঝ মন।

শরীরী সেতারে শুদ্ধ রাগিনী বাজেনি
সত্য-মিথ্যার হিসাব মন চায়নি
মন যেন আজ নির্বাসিত কোন অজান্তে
জীবনের নিশ্চল মুহূর্তে
সবই যেন রিক্ত নিঃস্ব
জীবন সায়াহ্নে, বার্ধক্যের দ্বারে এসে
এ যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি।

ফিনিক্স ও গোলাপ ■ আমজাদ হোসেন

উঠিয়ে রাখা 'তাক'-এ
ভালোবাসা একসাথে।
কোরানের পাশে গীতা, গীতার পাশে কোরান,
মিছিলে পা মেলায় ক্ষুধার্ত প্রাণ।
তবু দিন শেষে ভাগ হয়,
কে হিন্দু, কে মুসলমান।
চিতার ছাইভস্মে হাতড়াতে থাকি,
ফিনিক্সের খোঁজে।
ফুটন্ত গোলাপ,
কবরের বুক চিরে,
প্রাণ পায় কার রস শুষে?

আজ শেষ সন্ধ্যা
উপভোগ করো লালচে আকাশ,
একটু পরেই গভীর অন্ধকার।
কেউ করে ক্যান্ডেল ডিনার,
কারা যেন নিজেকে জ্বালায়,
একটু আলোর খোঁজে।
হাজারো নক্ষত্র জ্বলেছে,
কাজে আসেনি।
আমার সূর্য চাই, ভোর চাই,
ভোরের ফুটন্ত আলোয়,
'গোলাপ' হাতে 'ফিনিক্স' চাই।



অমীমাংসিত ■ পার্থ মুখার্জী

একটুরো চন্দন কাঠ
দু-চারটে বাঁশ পেটাতেই
প্রতিদ্বন্দ্বী হীন বিঘে দুই।

কুণ্ডলী পাকানো ঘন কালো ধোঁয়ায়
দুই-বিঘে জমির খতিয়ান।

পচা ঘুণ ধরা বাঁশ-কাঠের ছাউনি
মাঝে বিঘে দুই,
গণ্ডূষ প্রাক্কালে মেঘেদের মুখ ভারী
নিয়ম শান্তি শিকায় থাক
বিঘে দুই-এর অশুচ থাক।

অপ্রকাশ্য ■ সৌম্য পাল

হৃদয়ের জমাট বাঁধা কথা চুঁইয়ে পড়ে,
মাকড়সার জাল বোনা স্বপ্নরা আটকে যায়
কৃত্রিম গাম্ভীর্য নীরবতাকে স্তব্ধ করে,
রূঢ়সত্য আজও বিরাজমান সুপ্ত অবস্থায়।

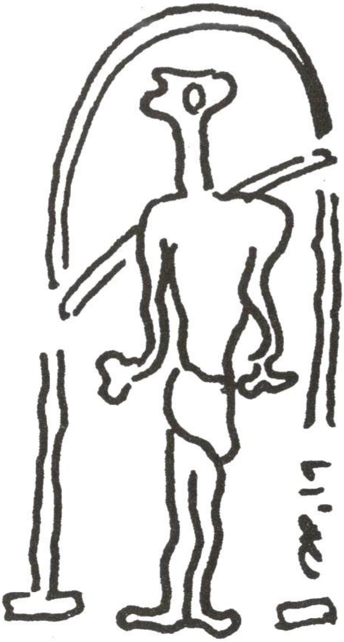
হৃদয়ের নিঃশ্বাসে ভিজে চুলের ঘ্রাণ,
গোধূলি আলোয় পাহাড়ি ঝর্ণার স্নান।
অভ্যন্তরীণ আলোড়ন যেন একটুকু বাতাস,
জিভ ও ঠোঁটের দ্বন্দ্ব এক অতিপুরাতন ইতিহাস।।

'কায়াহীন ঘাটে' পলাতক সৈনিক ■ বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

পরিত্যক্ত মাস্তুলের ফাঁক দিয়ে
আমি সূর্যাস্ত দেখলাম
স্তব্ধ ফেরিঘাটে।
লড়াই শেষের সূর্যাস্ত, নির্মম,
নিঃসাড় বেআব্রু।

আমার চারপাশে বুমেরাং লাশ,
মুক্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।
আমি আজ অবিসংবাদী
পলাতক সৈনিকের ভিড়ে নগ্ন।
আমার প্রতিবাদী সংলাপ,
প্রতিশ্রুতিহীন, বিচারের এজলাসে।
আজ হরিধ্বনিতে বন্দি।
মজ্জায় খঞ্জনির স্বরলিপি
বেঘোরে, অসুর নিধনে মত্ত।

আমি সূর্যাস্ত দেখলাম,
কায়াহীন অস্তিত্বের মাঝে,
তাচ্ছিল্যের অট্টহাস্যে।
আমি সূর্যাস্ত দেখলাম
পরিত্যক্ত মাস্তুলের ফাঁক দিয়ে
রক্তাক্ত ঘাটে
লড়াই শেষের সূর্যাস্ত।



নির্জন দিগন্ত রেখা ■ বঙ্কিম কুমার বর্মন

একা একা কত যে কথা বলা হয় নিজের সঙ্গে
এই যেমন কোথায় হারিয়ে গেল দুরন্ত শৈশব....
কাশফুলের বাহার শিউলির গন্ধে উৎসবের নানা রং...
হেমন্তের ঝরাপাতার শব্দে একেকটা মুহূর্ত রুলটানা কাগজ
মনখারাপের বিকেলে বেসুরো পাখির গান
মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়ি শিশিরভেজা পুরোনো গল্পগুচ্ছে

আদ্যিকাল পেঁচার গানে জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
ভেসে আসে কার্ত্তিকের নবান্নের সুঘ্রাণ
মধুকর ডিঙায় আজও পাড়ি জমায় চাঁদসওদাগর

সমস্ত দিনের শেষে বসে হিসেব কষি বড্ড
কত কত উজান নাও ভেসে গেল কোন অজানায়
পাখিরাও আজ ভিড় জমায় নির্জন দিগন্তরেখায়।

আমি লিখে যাব কবিতা ■ সুজয় মজুমদার

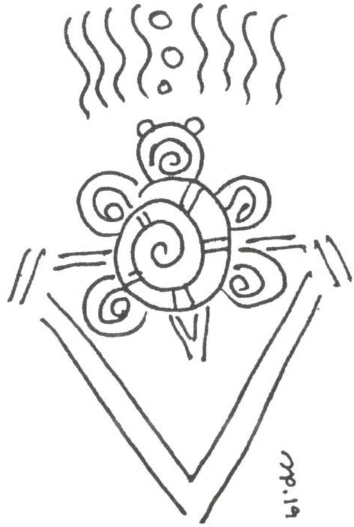
পড়ুক না পড়ুক কেউ
আমি লিখে যাব কবিতা
তোমায় ভালবেসে,
মাথা পেতে তুলে নেব
গুরু ভার যন্ত্রণা
মুখ ভরা হাসি হেসে।



মুখ ভারে প্রেয়সী
চাই তার রাশি রাশি
সাধ্যটা আমার মাঝারি,
যা আছে তা দিয়ে যাব
নুন দিয়ে ভাত খাব।
(তবু) আর নয় কান পেতে আড়ি।

অনুমান ■ সুব্রত সামন্ত

দেখেছি তোমায় ক্যানভাসে
শুধু পাতায় আঁকিনি জলছবি,
লজ্জিত কথায় আলতো চাউনি
ইস কী বর্ণনা! আমি এক কবি?
রামধনু রঙ মেখে আকাশে—
ডানা মেলে প্রজাপতি উড়ছে।
ভগ্ন মেঘ যেন চেনা মুখখানি
রূপ নিয়ে আকাশেতে চলছে।
আবেগের পালে ডেকেছি আগে
আসোনি বলেই রেগেছি খুব,
হিয়ার মাঝে ধরেছি হিয়া—
যেন গল্প কথায় প্রকৃতি চুপ।
সন্ধ্যা হলেই জোনাকির বেশ
কৃপণতা কর আবছা আলো,
সময়ের টানে কত কথা আজ
জেদের বশেই বয়ে নিয়ে চলো।।



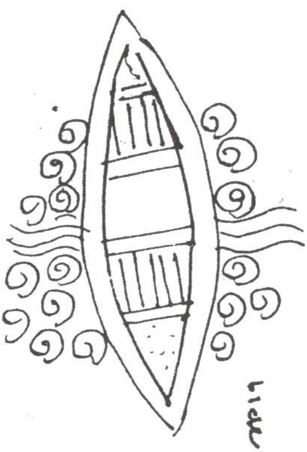
প্ল্যাটফর্মে ■ হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু চায়ের কাপ
কিছু সময়ের জন্যে একই কাপ
ভিন্ন ভিন্ন আঙুলে চলে যায়

চা শেষ হলে একটা চেনা প্ল্যাটফর্ম
ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত কত মানুষ
কেউ জানে না তারা কোথায় যাবে
যেখানে যাবে বলে এসেছে ভোরে
হয়তো সেখানে সে যেতে চায় না
কেউ কেউ অপেক্ষা করে আছে চলে যাবে বলে

আমি এদের একজনকেও বলতে পারবো না
আমি কোথাও যেতে চাই না
বলতে পারলে ভালো হয়তো

বলতে পারলে ভালো হতো
আমি কিছুই বলতে চাই না



তুমি আসলে ■ অর্ণব ভদ্র

তুমি আসলে শুকনো গাছে
সবুজের ছড়াছড়ি
তুমি আসলে ভুবন ডাঙ্গায়
রং-এর বাড়াবাড়ি।
তুমি থাকলে ভোরের বাতাসে
শিউলির গন্ধ
তুমি থাকলে অকারণ মনে
পুজোর আনন্দ।
তুমি কাঁদলে হারিয়ে ফেলি
নীল আকাশটাকে
তুমি কাঁদলে আমার শহর
জলে মুখ ঢাকে।
তুমি হাসলে বন্ধ্যা মাঠ ও
সন্তান সুখে পাগল
তুমি হাসলে সাঁওতাল গ্রামে
রোজ ধামসা মাদল।
তুমি চলে গেলে বুকেতে
বিসর্জনের কান্না
তুমি চলে গেলে হৃদয়ে
স্পন্দন তুলতে চাইনা।



লতা-পাতার সংসার ■ মারুফ আহমেদ নয়ন

পাখি শিকারী ফাঁদে মানুষ শিকার করছো,
হরিণের মাংসের কদর বোঝে না বনের বাঘ,
হরিণ-ই জানে একমাত্র লতা-পাতার সংসার,
ডুমুর পাতার আয়ুর ভেতরে গোপন করা কস্তুরী ঘ্রাণ
ও সুগন্ধী মাংসের গল্প,
এইসব বৃত্তান্ত খুলে বসলেই
দূর থেকে কেঁদে ওঠে মেঘের সংগীত,
বৃষ্টির চিরকালীন সহোদরা,
শুধু মানুষ জানে না,
নিরামিষ ভোজী সংসারে মাংস বিলাসী দ্রব্য মাত্র...

প্রত্যাবর্তন ■ ইতিকা বিশ্বাস

এই যে দাদা বৃষ্টি ভেজা মলাট মাখা
হাসছো শুনে বলছি কি বা।
হচ্ছো অবাক চক্ষু দুটি ছানাবড়া
এই যে তোমায় বলছি মা গো কানটি পেতে শোন
সারা দুপুর করেছো কি, গান দুটি বেঁধেছো।
ভালোই আছো গানের সুরে বৃষ্টির শব্দের তালে
ফিরে গেছো সেই পূর্বের ফেলে আসা দিনে।
বোধহয় বয়স এখন অনেক কমে গেছে এই মনোরম সন্ধ্যায়
বেশ ভালো সুরের গানটি দাদা ছড়াটিও অসাধারণ
তোমার মিষ্টি সুরে বলা এই যে দাদা বোলটি অমায়িক অসাধারণ
আরো ভালো হবে আর একবার চর্চা।
একবারেই বাঁ দিকে ফিরে দেখো দাদা কাৎ
আর একবার করলে হবে দেখো নিশ্চিত কুপোকাত
হৃদয়ের মাঝে মা জননী আমার
সারাজীবন রেখো বুকের মাঝে।

শিকড়ের টান ■ দেবপ্রতীম পট্টনায়ক

মাটির কাছাকাছি সংগ্রামগুলো হাজার ঝড়েও অক্ষত
শিকড়ের টান আবেগ নয় বাস্তবের স্পর্শ খোঁজে অবিরত।
ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকা মনে ভিড় করে আসে প্রশ্ন হাজার,
মায়ার জগতে হঠাৎ করে আসে চাহিদাদের তীব্র হাহাকার।
প্রিয়জনের সান্নিধ্য যেন ফিকে হয়ে আসে বয়সের ব্যস্তানুপাতে,
নতুনের হাতছানি এড়ানো হয়ে ওঠে অসম্ভব কোনোমতে।
তারপর একদিন ইচ্ছেরা পায় স্বাধীনতার স্বাদ
গুঁড়িয়ে যায় একে একে অবরুদ্ধ পথের সবকটা বাঁধ।
অচেনা আঙ্গিকে নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার
স্নিগ্ধ মনে ততক্ষণে উধাও অপ্রাপ্তির সব হাহাকার।
হঠাৎ উপলব্ধির প্রবল বাতাসে, ক্ষণিকের স্মৃতিচারণ,
ভালো-খারাপ এসবের গুলিয়ে যাওয়া সমীকরণে আর কেউ নেই করতে বারণ।
একা খুব একা, আছে সুখ, আছে দুঃখ কিন্তু আজ নেই কেউ নিজের ভাগ করে নেওয়ার,
পরিপূর্ণ স্বার্থ, তবে মাটি থেকে দূর
নিজের অস্তিত্বের থেকে দূরে আজ কোথাও নেই যাওয়ার।
শিকড়ের টান, আছে অবিরাম, তবে দূরত্ব যেন আলোকবর্ষ
চেয়েছি যা কিছু, পেয়েছি সব তবু "শিকড়ের" অভাবে মন আজ বিমর্ষ।

কালবেলায় ■ বিদ্যুৎ সরকার

এক এক সময় ঝড় আসে
বড়ো বড়ো কালো কালো ঢেউ
আছড়ে পড়ে তোমার চেতনায়,
তোমার সত্বায়।
সব ভেঙেচুরে
তছনছ করে দিতে, চায়—
সব সমান করে দিতে চায়—
তুমি আর জনপ্রিয় শিয়াল,
ধান্দাবাজ আর তুমি! তোমার
মানসতটে,
সত্বার বেলাভূমিতে।

জোয়ারের জলে ভেসে আসে
পচা গোরু, মৃতদেহ, বর্জপদার্থ যত—
তোমায় গা ঘেঁষে চলে যায়—
তোমায় ধাক্কা মারে—
তোমায় টলাতে চায়—
তোমায় ভাসায়! তবে কি—

হ্যাঁ, তুমি পিছিয়ে আসতে পারো,
ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারো,
হয়ে যেতে পারো আরও একটা
মৃতদেহ। ওঁ শান্তি।

অথবা, আদর্শে সঠিক থেকে—
এগিয়ে না যেতে পারো, অন্তত
মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারো।

ভাঁটার সময় দেখবে—
তোমার কাছে-পিঠে
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে
এমন অনেক "তুমি"।

সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, দ্যাখো!
একা।
আমার হৃদয়-মন
সব উন্মুক্ত করে!

হীরকদ্যুতি ■ অঞ্জনা দাস

হঠাৎ করে বজ্র বৃষ্টি
প্রকৃতির কি মনোরম সৃষ্টি
বজ্রাঘাতে দেখি বারে বারে
মা আছে আমার দরজার দ্বারে
কি অপরূপ সাজ মা তোমার
হৃদয় মাঝারে এসো তুমি মা
বলো গো জীবন কাহিনী।

গুরু গুরু করে গর্জে ওঠে
কত জমা ক্রোধ ধরেছিল বুকে
কার আহ্বানে কত অভিমানে
দুঃখে-শোকে-বিরহে-আনন্দে
হীরক দ্যুতির ঝলকে-ঝলকে
চকমকি যেন শুধুই চমকে
মণিমাণিক্যের দ্যুতির ছটায়
বৃষ্টির ফোঁটা লাগেরে
হৃদয় মাঝারে এসো তুমি মা
জীবন কাহিনী বলোরে।

আকাশের ওই বুক চিরে দেখি
সতেজ হলো যত গাছগাছালি
পাখীগুলো সব কলকাকলিতে
নতুন জীবন পেলরে
কিচির মিচির শালিকগুলো
আনন্দে নাচ করে রে
হৃদয় মাঝারে এসে তুমি মা
জীবন কাহিনী বলোরে
মা জীবন কাহিনী বলোরে।

মায়া নিদ্রা ■ মিঠুন মণ্ডল

আমি ইন্দ্রের থেকে ইন্দ্রজাল নেব শিখে,
তোমার রূপের মাধুর্য্য
রাখলাম কালিদাস হয়ে লিখে।
স্বর্ণ হরিণ তুমি খোঁপায় ময়ূরের পাখা,
কাজল কালো চক্ষু দুটি
এই হৃদয়ে রাখা।
তমসার মতো কালো কেশ, চঞ্চল করে মন,
স্বপনে তোমাকে পেয়েছি সদ্য
নিদ্রিত আমি যখন।
কুসুম কাননে ফুটিয়ে পুষ্প, হয়েছো তাহার মালি,
যৌবন মধু করেছো ধারণ
কেন হলে যে চোখের বালি?
ওষ্ঠে রয়েছে মায়াবী হাসি, ইন্দু পেয়েছে লজ্জা,
অন্তরে বিঁধেছে প্রেমের তির
যেন ভীষ্মের শর-সজ্জা।

ভাঙে না ■ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ভেঙে ভেঙে টুকরো করে
দেখেছ গেছে আবার জুড়ে
কিছুতেই ভাঙে না মানুষ,
কিছুতে মানুষ স্বপ্ন দেখতে
ছাড়ে না।

যত ঘুম পাড়াও তাকে
সকাল হলেই সূর্য ডাকে
অন্ধকারের বুক চৌচির,
বন্ধ দরজা খালি হেরে যায়
পারে না।



ছুটি ছুটি ■ জয়িতা চ্যাটার্জী

সারা সকাল আকাশেতে
রোদের ঘনঘটা,
স্কুলের গাড়ি আর আসে না
বাজুক যতই ছ'টা।

দুপুর হলেই এক গলা রোদ
বৃষ্টি নামে কই?
হাঁচোড় প্যাঁচোড় সারা বেলা
ঘামেতে থৈথৈ।

উঠোন জুড়ে বিকেল বেলা
কুমীরডাঙা খেলা।
টং টং টং ঘন্টা বাজে
আইসক্রিমের ঠেলা।

আলোর পিছে ছুটতে পারি
ধরতে পারি ছায়া
এক হাতে তে হারমোনিয়াম
আরেক হাতে বাঁয়া।
বিভোর হয়ে গাইতে থাকি
ছুটি ছুটির গান,
আকাশ যেন ভেঙেচুরে
রোদ্দুরে খান খান।।



কোন দিন ■ অনিল দাঁ

কোনদিন দেখেছো কি
প্রভাতের লালরঙা
রবির কিরণ,
কোনদিন জেনেছো কি
বাসে চড়া হইচই
শিশুদের মন।

কোনদিন খেয়েছো কি
ডালধরা ঝাঁকুনির
গাছপাকা ফল
কোনদিন দেখেছো কি
বেহিসাবি নড়ে ওঠা
পুকুরের জল।

কোনদিন দেখেছো কি
মধ্যবিত্ত বিনোদন
এলোচুলে গাঁথা
কোনদিন শুনেছো কি
ছুটে চলা বাতাসের
ফিসফিস কথা।

বেঁচে থাকা আশা বুকে
খুঁজে পাবে পথ রেখা
ফলিত জীবন।

প্রেরণা ■ স্বপনকুমার বিজলী

সকাল হলে কিচিরমিচির সারা পাড়া জুড়ে
ক'টা শালিক খেলে বেড়ায় সবার বাড়ি ঘুরে
আমি তখন ঘুমে
দু চোখ আমার ঠিক খুলে যায় মায়ের মিষ্টি চুমে।

সূর্য্যি ওঠে খুব সকালে, সোনালী রোদ ঝরে
টবের গোলাপ গন্ধ ছড়ায় উঠোন এবং ঘরে
মনটা নেচে ওঠে
সকাল হলেই চারিদিকে খুশির ছবি ফোটে।

প্রজাপতি খেলে বেড়ায় ফুল বাগানের মাঝে
দেখি ওরা ব্যস্ত কেমন সবাই যে যার কাজে
এদের দেখে শিখি
এরাই আমার প্রেরণা দেয়, তবেই পড়ি লিখি।

স্পর্শ, গন্ধ এবং অস্ফুট কথা ■ সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পর্শটুকু রেখে যখন তুই শু্য-রেকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালি
তখনও তোর পারফিউমের গন্ধের ভিতর থেকে প্রজাপতি উঁকি দিচ্ছে।
আর আমি ভাঁজ করা পর্দায় অর্ধেকের বেশি শরীর ঢেকে মুচকি হেসে অর্ধনারীশ্বর

তুই চোখ না তুলেই অস্ফুটে বললি—
"আবার আসিব ফিরে..."
ক্ষণিকের জন্য জীবনানন্দ ঝিলিক দিল বুকে,
আর একটা আস্ত রঞ্জনা নদী জন্ম নেবার তাগিদে তার ভ্রূণ নিয়ে
জরায়ুর ভিতর বদর বদর শব্দে পাল তুলে দিতে লাগল।
যখন চৌকাঠ পেরিয়ে গেলি, স্পষ্ট দেখলাম
আমার মতো একটা দুঃখী ছায়া তোর পাশে,
যে অস্ফুটে গাইছে—
"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী..."

প্রেয়সী ■ মৃন্ময় মাহাত

বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে
চেয়ে আছি রাঙা মাটির মেঠো পথ পানে
গেঁথেছি পলাশ ফুলের মালা
সুবাসিত আজ ঘরের প্রতিটি কোণ
মন মাতানো কুড়চি ফুলের গন্ধে।
হারিয়ে যাবো মায়াবী চোখের খেলায়
প্রেম ভরা থাক প্রাণের অন্তরালে
চোখের ইশারায় ধ্বনিবে বুকের ব্যথা
অশ্রু মুছিও আঁচল খানি দিয়ে।

হৃদয় মাঝারে স্বপ্নের দেশে
বসন্তের ঝরা পাতা পড়ন্ত বেলায়
সূর্য অস্তমিত রূপের ছটা
বিহঙ্গ ফিরে যায় আপন নীড়ে,
আঁচল খানি পেতে দিও ওগো
কাজল নয়না হরিণী।
দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসানে
তোমার পরশে নিদ্রালস চোখের কোণে
আসুক নেমে শান্তির ঘুম।



মলাট ■ শৈলেন পাত্র

আমার অসময়, যত্নে তুলে রাখো তাকে
বেহিসেবী সব বায়না মেনে নাও সহজে।
কতবার মন ভেবেছি তোমায়, ভেঙেছি আমায়
তবু ভুলে ভরা আমায় রাখো আদরের মলাটে।

মলাট দেখেই ভাবি, নিশ্চিন্তে ডাঙ্গায় আমি
প্রচ্ছদের ছবিতে বেঁচে থাকে কচ্ছপ।
পাতা উল্টে পড়িনি কতদিন, ভিতরে উই-এর স্তূপ।

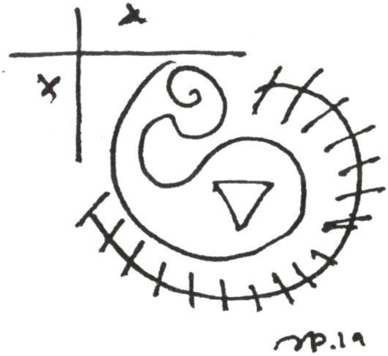
শেষ আশা ■ সুশান্ত মণ্ডল

ম্লান প্রদীপ শিখাতে
নিস্প্রভ আলোর ছটা,
নিভতে থাকা উদ্যমে
ফের জাগালো আশার ফোঁটা।

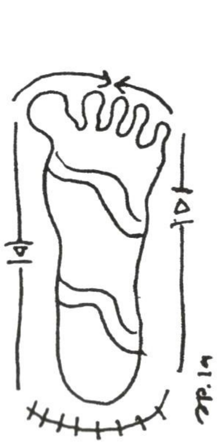
অস্তমিত সূর্যালোক
আসন্ন গোধূলিতে,
রাঙিয়ে দিল আকাশটাকে
রক্তাভ তুলিতে।

মুদ্রার মতো জ্বলতে থাকা
সহস্র তারা হতে
রুপোলি আলো পড়ছে ঝরে
এই মাটির পৃথিবীতে।

শুশনি শাকের শীর্ষ শেষে
জোনাকীর নগন্য আলোকে,
স্বাগত জানাচ্ছে তোমায় বন্ধু
নীল ফড়িং এ পালকে।



ষড় রিপু ■ দীপশংকর সাঁতরা



এসেছি যখন যেতে হবে
যতই করো মানা
মধ্যে শুধু হাসি কান্না
ষড় রিপুর হানা।

এই হানাতে কাবু আমরা
কেবল ঘুরে মরা
সুখের আশায় সবাই ছুটি
যায়না তারে ধরা

ম্যাডোনার প্রেম ■ কৌশিক দাস



শহরের পুরানো রাস্তায় জমানো স্মৃতি
ভরিয়ে ফেলেছিল যে ডাস্টবিনটা
যার আঙুলের ছোঁয়ায় জেগে উঠেছিল
মরে যাওয়া ম্যাডোনার হৃদপিণ্ড
তার গভীরতা শুধু আমি জানি।

যে এলামণ্ডা ফুলের গন্ধ ভালোবাসে অনেকেই
এখন তাকে আর ঘরে আনিনা
রাত জাগা বাসি ফুলগুলো
আজও পার্ক স্ট্রিটে খোঁজে আমায়।
যে রাত রাত্রি শেষে আরও আমাকে নিয়ে খেলা করে
তার জন্য ডিজে চালায় শব্দটা মিউট করে।

গভীর রাতে খুঁজি আজও মরীচিকা
পার্ক স্ট্রিট তাই রোজ দাঁড়িয়ে থাকে আজও আমার জন্য একা।

দ্বন্দ্ব ■ কার্তিক পাত্র

তুমি দেখবে সিরিয়াল আমি দেখব খেলা
তুমি এখন টিভি দেখ আমি দেখব ও বেলা।
সারাদিন রান্না ছাড়া আরো আমার কত কাজ
রোজ যাই অফিসে করি না কোনো অ-কাজ।
টিভি নিয়ে দুজনের লেগেছে বিশাল দ্বন্দ্ব
সংসারেতে ঢুকে গেছে রাজনীতির গন্ধ।
ঝগড়া করে বউ চলে গেল বাপের বাড়ি
বলে গেল তোমাকে ডিভোর্স দেব তাড়াতাড়ি।
সংসার-এর থেকে বউ পেতে চায় মুক্তি
উকিলের কাছে গিয়ে নিয়েছে কোনো যুক্তি।
সাতদিন পরে দেখি দিয়েছে ঠুকে মামলা
বন্ধুরা হেসে বলে এইবার ঠ্যালা সামলা।

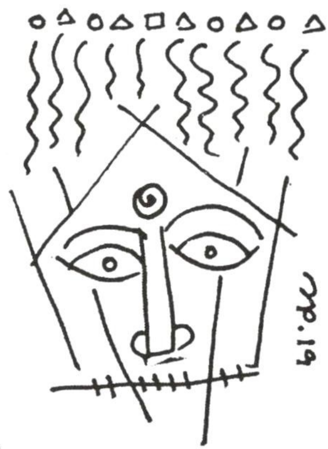
ভালবাসায় জড়িত থাক ■ সৌরভ রায়

অঝরা বর্ষার শেষ বিকেল টুকু আমাকে দিও
ক্লান্ত পাখিদের ঘরে ফেরার মানা আজ,
শান্ত পথের ধুলো আজ উড়বে আরেকবার
একটু আধটু ভাললাগা অনেকটা
ভালবাসায় জড়িত থাক।

গোধূলিলগ্নে তোমার হাতটা আমার হাতে দিও
রক্তিম গোলার অস্ত যাওয়া মানা আজ,
পাষাণ হৃদয় গলবে আরেকবার
এই মুহূর্ত টুকু স্মৃতি হয়ে
ভালবাসায় জড়িত থাক।

সাঁঝবেলাতে মোর দুয়ারে তোমার প্রদীপ দিও
সন্ধ্যা-মালতিদের চোখ মেলতে মানা আজ,
না বলা সেকথা বলতে চাই আরেকবার
আমার সাঁঝের গান আজ তোমার
ভালোবাসায় জড়িত থাক।

রাতের আঁধারের কোমল স্পর্শটুকু দিও
চাঁদের আলোর চোখ বুজতে মানা আজ,
শিরা ধমনীর শিহরণ পারদ ভাঙবে আরেকবার
আমার কাব্যটুকু তুমি হয়ে থাক তোমার
ভালবাসায় জড়িত থাক।



আলো ■ মহুয়া বেগম

কারো ইগো আরু সাম্প্রদায়িকতা
দিয়েছে বড় দুঃখ ব্যথা
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভালোবেসে আছি ভালো,
ভালোমানুষের আন্তরিকতা দিয়েছে আলো।

তুমিই আমার কবিতা ■ সৌগত দাস

মনে পড়ে আজও সে স্বর্ণালী মুহূর্ত সে মায়া মুখ
কাজল সে আঁখি দুটির নিস্পলক চেয়ে থাকা
প্রথম দেখায় সে অজানা অসুখ।
মনে পড়ে যায়, সে মধুর হাসি, তার সুবাসিত ঘ্রাণ
লাজুক মনের সে আধোকথা, আকুল ব্যকুলতা
কেমন জাগলো বলে, বসন্ত যৌবন...

ক্ষণিকের পরিচয়, তুচ্ছ কিছুই নয়
যে মুখ দেখেই সুখ—বিশ্বর ভুবন মাঝে
কেমন সে প্রেম? কেমন সে ভালোবাসা?
কোন সে অদৃশ্য টানে দুটি মনের কাছে আসা।
ঈশ্বর দিয়েছে প্রেম, তাই তুমি দাও অন্যেরে
প্রেমেই ঈশ্বরের পূজা, বিশ্ব ও চরাচরে
ছোট্ট এ জীবন সহজেই ফুরায়ে যায়
ভালোবাসা স্নেহ প্রেমেই জীবনে তার মানে পায়।

আমরা হায়! তুচ্ছ মানব, কেমনে রাখি চিরতরে?
পেয়ে হারানো, ভাঙা-গড়া, আশা-নিরাশা খেলাঘরে।
তোমার আগমন, হাজার স্বপ্ন রঙে
কবিতায় রেখেছি তা গভীর যতনে,
সে সময় মিলিয়েছে দোহে, সেই যে করেছে ছিন্ন
দূর সে যতই সুদূর হোক, প্রেম তবু হৃদয়ে অভিন্ন।



বসে বসে ভাবি ■ মায়ারাণী সাহা

বসে বসে ভাবি আমি
দিন চলে যায়
মন আমার খুঁজে বেড়ায়
তোমারে না পায়
চারিধারে চেয়ে দেখি
কেউ আমার নয়
সবাই আসে সবাই যায়
জগৎ স্বার্থময়।
নিজের কথা ভাবে সবে
লাগে পিছে ভয়
তুমি এসে দাও গো দেখা
হয়ো না নির্দয়।
তোমার চরন বিনে প্রভু
মুক্তি নাহি পায়
আঁধার মাঝে ঘুরে বেড়ায়
পথ হাতড়ায়
বসে বসে ভাবি আমি
দিন চলে যায়।



স্বপ্ন বাসরে ■ দুলাল সুর

তুমি এসেছ নিত্য স্বপ্ন বাসরে
সযত্নে রেখেছি ছবি মনের অন্তরে
কত নিশি হলো ভোর বিরহ রোদনে
ছলনার নিষ্ঠুরতা ভেঙেছে দহনে।

কোজাগরী দুপুর ■ পার্থপ্রতিম সামন্ত

নির্জন নিরালা দুপুর-
অন্তরাল থেকে বেলফুলের দল,
শ্বাসনালী চেপে ধরে দিনের।
আকণ্ঠ পান করছি
রৌদ্রদগ্ধ দুপুরের নির্জনতা।
পুকুরের সোনালী জলের গায়ে
উচ্ছলতায় নিরালা ভাঙ্গে মাছরাঙা;
রূপসী ফড়িঙের দল
কচুরিপানার বেগুনী ফুলে বসে
জলজ প্রেমে আর বিশ্বাস রাখেনা...।
আকুল হয়ে গন্ধ নেয়
ক্লান্তি ও অন্যমস্কতা।

কোজাগরী দুপুরে,
কোমল-গান্ধারে ভাসে
শ্বেত-পদ্মের ছিন্ন পাপড়ি।

হে জলদ রাশি
উষ্ণ আহ্বানে উন্মুক্ত করলাম
উষর দিগন্ত রেখার সিংদরজা...।
হৈ হৈ করে চলে এসো
স্বার্থপর গ্রীষ্মের রুক্ষ উঠোনে।
নীড়হারা পাখিদের ইথারে পাঠাও
উজানের গান আর যুগ-যুগান্তের রূপকথা,
বৃষ্টির ঝরণায় পেখম তুলুক বালিয়াড়ী ময়ূর।।

পুণ্যকামী ■ দেবদত্ত ভট্টাচার্য

নদীর পাড়ে বসে আছে নদী
হাতে কমণ্ডলু;
তার দরকার পবিত্র জল
একটু পুণ্যফল।
জলে সে হাত ছোঁয়াতে পারে না
পা লাগাতে পারে না
স্পর্শমাত্র জ্বালা
পুড়ে যায় সর্বশরীর।

শুনেছিলো মহাদেবের জটা থেকে তার উৎপত্তি
পরে জেনেছিলো মেঘ আর হিমের সঙ্গমে তার জন্ম;
সারা জীবন সে আদিষ্ট কর্মই শুধু করে গেছে।

আদিকালের কথা স্মরণ করলে মনে পড়ে
মুনিঋষি আর তপস্বীদের কথা
তার স্বচ্ছ ধারায় কত না জপ ধ্যান, পূজার্চনা তর্পন
কত না পশুপাখি আশ্রমিকদের অবাধ অবগাহন,
তৃষিত আর দেবগনের
সে ছিলো বড় প্রিয় আর পেয়।

এরপর এল ইতিহাসের অন্ধকার যুগ : সতীদাহ;
কত শত সদ্য স্বামীহারা ভস্ম হয়ে গেছে সহমরণে
তাদের অস্থি সে বহন করে নিয়ে গেছে সাগরে;
অন্তর্জলির অন্তিম যাত্রার কথাও তার মনে পড়ে,
গঙ্গাপূজার ছলে জোর করে নদীতে সন্তান বিসর্জন—
এও তো সেদিনের কথা—অসহায় জননীর বুকফাটা আর্তনাদ
এখনও মর্মে বড়ো বাজে।

আজও সে বহমান,
মানুষের বিশ্বাসে আজও সে পুণ্যতোয়া
পাপস্খলনের নদী;
ব্যর্থকাম আর ব্যর্থপ্রেমের অন্তিম আশ্রয়।

নদীর পাড়ে বসে আছে নদী
বর্জ্য প্রবাহে আজ সে পুতিগন্ধময় জরাগ্রস্থ
সর্ব অঙ্গে পাপ আর ক্লেদ
তার চাই এক কুশি জল
পবিত্র জল। একটু পুণ্যফল।

আমি সেই ভ্রূণ ■ মিলি দাস

মনে পড়ে বাবা আমার কথা
চাঁদনী রাতে মেঘ ভেসে যায়
তোমরা খুস মেজাজে
নীলাঞ্জনা আজ কি হবে?
লাজুক মুখে একটু হেসে
তুমি না বড্ড বাজে

ফুলদানিতে রজনীগন্ধা, সঙ্গে গোলাপও ছিল,
রাতের পোশাকে সুগন্ধী ভাসে
শয়নের মাঝে গেল।
আষ্টে পিষ্টে বুকের মাঝে
চুমুতে ভরিয়ে দিলে
আদর করে পিঠের আঁচিল
কামড়িয়ে ধরেছিল।
ভালোবাসাবাসি খুব কাছাকাছি
সূচ বিঁধবে না মাঝে,
শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মেলে
চুপিচুপি বেশ লাজে।
এক চিলতে জোছনার আলো
ম্লান মুখে এসে পড়ে
থরথর চোখে নীলাঞ্জনা যাচ্ছ বা কেন সরে?
মায়ের চোখে ভুলের রেখা বিপদ হলো কি!
আবার যদি তৃতীয় আসে ছি ছি ছি ছি!

তখন আমি ডিম্বাশয়ে রক্ত জমা প্রাণ
প্রাণের মাঝে সুর গাইছে নতুনের জয়গান।
ভোরের আলো দেখা দিতেই সিদ্ধান্তের শুরু
ভয়ে তখন বুকটি আমার করছে দুরুদুরু!
বাবা আমি বাঁচতে চাই প্লিজ আমায় বাঁচাও
মাগো আমি মরতে চাইনা একটুকু আশা দাও।
ও বাবা, শোনোনা হয়তো আমি
দুষ্টু ছেলে হব, তবুও আমি নাম করবো
তোমার গর্ব হব।
যদি বা হই মেয়ে সন্তান
চিন্তা করো না বাবা
রাক্ষসী হয়ে থাকবো না আমি
পুঁজিতে দেবো না থাবা।

ও মা শোনো না
ওদের হাতে দেখছি চুরি কাঁচি,
আমার ভীষণ ভয় করছে
থাকবো কাছাকাছি।
ওমা কি গো কোথাও যাবো না
তোমাদের কাছে থাকবো
তোমরা আমায় সৃষ্টি করেছো
তোমার আঁচলে ঘুমাবো।

ওরা আমায় মেরে ফেলছে
প্রাণটা এখনো আছে
মরতে আমি চাইনা গো মা
থাকবো তোমার কাছে
এত চিৎকার এত হাহাকার
শুনতে পেলে না তোমরা
এ পৃথিবীর সুখভোগ করা
আর এক জল্লাদ তোমরা

হয়তো আমিও মানুষ হতাম
নয়তো কোনো অমানুষ
ভ্রূণ হত্যাকারীকে তোমরা
কি করে বলো মানুষ?
আমি ওদের জল্লাদ বলি
শয়তান বলি মুখোশে
প্রেম ওদের যখন তখন
জানোয়ার হলো স্বভাবে।

জওহর ■ ঋজুলেখা দত্ত

আগুন ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে হেঁটে যাচ্ছ
বাসি ফুলের আসনে জাগছে রাত
গ্রহণে নাকি সমর্পণে?
পৃথিবীর সবটুকু ভালো বা কালো...

ইতিহাস ঘুরপাক খায়
প্রতিরোধের অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন,
মৃত কাঠের ওপর আগুন জন্ম।
শোক ও বন্ধুর বেশে—
কাকের ঠোঁটে পাথর...
সন্দেহ জল উঠে আসে।

নিভবে না জেনেও তবু
আগুনকে প্রেম জানে নারী
সব নারী নদী হয় না—
জওহর পুড়াক বুক...
খাক-এ খুঁজো নির্যাস!

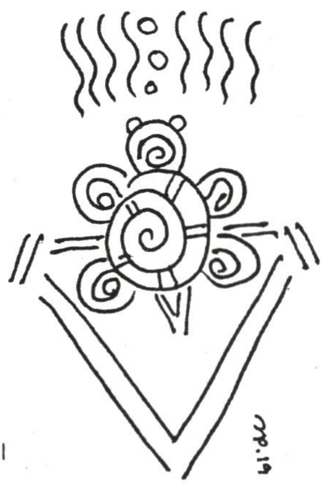
অভিমানী সুখ ■ রথীন পার্থ মণ্ডল

এখনও গোধুলী রঙ আনে
বৃষ্টির পরে সোঁদা গন্ধ,
এখনও মাটির ভাঁড়ে গরম চুমুক
এখনও অভিমানী রাত গড়ে দ্বন্দ্ব।
এখনও আলোর ভাঁজে আঁধারের সুখ,
এখনও মন কেমনের ঘরে তোমার মুখ।

ঈশ্বরের কান্না ■ ঘনশ্যাম কল্পতরু

চাঁদ আছে, বসন্তের দখিনা বাতাস
ফুলে ফুলে গন্ধে বর্ণে আলিঙ্গন উচ্ছ্বাস।

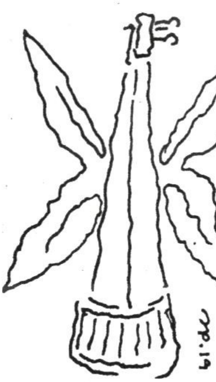
তবুও ঘর্মাক্ত কপাল বেয়ে নদী চলেছে...
লেলিহান শিখার দিকে।
তাই সীতাকে ফিরিয়ে নিয়েছে অতৃপ্ত পৃথিবী।



ব্রহ্মসাগর ■ ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী

সব নদীই মেশে সাগর জলে
সে যে এক অদ্বিতীয় মনের ব্রহ্ম সাগরে।
যেখানে ভেদ নেই দ্বন্দ্ব নেই আছে অনন্ত প্রেমের সৈকত।
অতল গভীরতার কৃষ্ণ মননে।
সব নদীর স্রোতে ভাসাই ডিঙি
পৌঁছাতে যাই একই মনব্রহ্মসাগরে।

বন্ধ্যা ■ মানসী বিশ্বাস



পানকৌড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল আমার
কাছে। বন্ধ্যা গাছ বেড়ে ওঠে লাফিয়ে লাফিয়ে
প্রজননের আশায়। অসূর্যস্পর্শ্যা হয়ে ক'দিন
এড়িয়ে নিয়ে দেখি লক্ষ্যের চাদর ভ্রষ্ট হয়। বালির
শরীর অবক্ষয়ের কথা ভাবায়।

হারমোনিয়ামের ওই উহ্য কোমল 'মা' জানান দেয়
পোড়া গন্ধ। কেতক দাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে
পড়েছি অভিশাপের বলিরেখা।

মরা গাছেও কুমড়ো হবে, বুঝলে...

যন্ত্রণা ■ দেবস্মিতা বণিক

অন্ধকূপ মাঝে অভিশপ্ত কালরাতে
যখন মনে পড়ে কোন দোলায়িত মাধবীলতা,
হিমশীতল কঠিন বাহু তখন কায়া ছুঁতে মগ্ন।
লুব্ধ চুম্বনের ব্যথিত ঘায়ে দগ্ধ অভিসারীর
ভালোবাসার শিল্প চেতনায় নগ্নতার প্রকাশ তখন।
ব্যর্থতার আর্ত চিৎকারে ঘিরে জীবন অধ্যায়
বিশ্বাসকে অবিশ্বাসের সংকল্পে দৃপ্ত মনন
অনুভূতির কোষদেহে ওদের শুধুই মৃতের বসন।

ভ্রমণ ■ বোলপুরে তিন রাত ■ অনির্বাণ ঘোষ

বোলপুর-শান্তিনিকেতনের প্রতি সব বাঙালিরই এক আত্মিক টান আছে। গ্রামবাংলার অপরূপ প্রকৃতি আর তার সাথে জড়িয়ে থাকা বাঙালির চিরন্তন আবেগ, সেই মেলবন্ধনের টানেই চললাম বোলপুরের পথে।

সকল ৯টায় ট্রেনে উঠে ১.৩০টায় এসে পৌঁছলাম বোলপুর। সেখান থেকে চললাম সোনাঝুরি জঙ্গলে। জঙ্গলের মধ্যেই আমাদের তিনদিনের আস্তানা 'রাম শ্যাম ভিলেজ রিসর্ট'। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে টোটো ছুটেছে। দুদিকের ঘন জঙ্গল চোখ ও মন দুই-ই জুড়িয়ে দিচ্ছে। এক অদ্ভুত ভালোবাসা মনে ছড়িয়ে পড়ল। রিসর্টে এসে পরিবেশটা এতটাই ভালো লাগল যে পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এক নিমেষে। গ্রামবাংলার একটুকরো ছবি ফুটে ওঠে এই রিসর্টে। বাঁশ বেতের কাজ করা দরজা জানলা মাটির ঘর সদৃশ সবকটি ঘর, চারদিকের সোনাঝুরি জঙ্গলের ঘন বনানী এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। চমৎকার অন্দরসজ্জা। সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে নীচে লাঞ্চ করতে গেলাম। নানারকম পদে পেটের সাথে মনও ভরে গেল।

বিকেলে বেরোলাম টোটো করে কঙ্কালিতলা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সোনাঝুরি থেকে ৮ কিমি দূরত্ব। একান্ন সতীপীঠের সর্বশেষ পীঠ এটি। এখানে সতীমায়ের কোমরের অংশ পড়েছিল। এখানে মায়ের মর্মর মূর্তির পরিবর্তে ছবিপূজা করা হয়। সকাল ৮টায় মন্দির খোলে। মন্দিরের পাশেই রয়েছে সতীকুণ্ড। অরণ্যের মাঝে সাঁওতালি গ্রামের মধ্যে এই মন্দিরের চারপাশটা বেশ ছমছমে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আর পাখিদের সুমধুর কলতান মুগ্ধ করবেই। সন্ধ্যে ৭টায় আরতি দেখে রিসর্টে ফিরে এলাম।

ফিরেই দেখলাম রিসর্ট কর্তৃপক্ষ বাউল গানের আসরের আয়োজন করেছে। বাবলু দাস বাউল একতারা খঞ্জনী নিয়ে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। এক কাপ চা নিয়ে বসে পড়লাম সকলের সাথে। সোনার গৌরের মিঠে গানে মায়াবী সন্ধ্যা আরও আকৃষ্ট করতে থাকে মনকে।

পরদিন ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে রিসর্টের চারপাশটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হল। পিছন দিকে চমৎকার বেগুন, ঝিঙে, পটল, কুমড়ো চাষ করা হচ্ছে। টোটো বলাই ছিল আগের দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। সকাল ৮টায় বেরিয়ে দুপুর ২টো নাগাদ ফিরলাম। এবার বলি কি কি দেখলাম।

প্রকৃতি ভবন সোনাঝুরি থেকে ৩ কিমি এর মধ্যে পড়ে এই প্রকৃতি ভবন। প্রাকৃতিক ভাস্কর্য্যে সুসজ্জিত এই জায়গা। শিল্পীর কল্পনায় এক একটা পাথর ও ও গাছের গুঁড়ি প্রাণ পেয়েছে এখানে। টিকিট মূল্য ২০ টাকা, সকাল ৯টায় খোলে। ভাস্কর্য্য শিল্পের ৩টে সংগ্রহশালা আছে এখানে। ৩৪ ফুট বুদ্ধমূর্তি। আমার কুটির হস্তশিল্প— চামড়া, বাটিক ও আরও নানা জিনিসের শিল্পের বেচাকেনা হয় এখানে। রবিঠাকুরের সুউচ্চ মূর্তি এই স্থানের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়েছে।

কোপাই নদী—আমার কুটিরের পাশ দিয়েই কোপাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটু

হেঁটে গেলেই চোখে পড়বে 'আমাদের ছোটো নদী', বৈশাখ মাসে যার হাঁটু জল থেকে।

লাল মাটির পথ— রবিঠাকুরের সেই মন ছুঁয়ে যাওয়া গানের কলি 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' যে পথকে উদ্দেশ্য করে লেখা সেই পথে এগিয়ে চললাম।

শ্রীনিকেতন—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ। বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশুনার জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ দেখবার মত।

সরুলের রাজবাড়ি/সরকার রাজবাড়ি—সরকার পরিবারের রাজবাড়ি প্রায় ১৫০ বছরের ইতিহাস বহন করে চলেছে। প্রবেশ করতেই সর্বপ্রথম নজরে পড়ল সামনে থাকা নাটমন্দির। তারপর অন্দরমহল। বর্তমান প্রজন্মের পরিবারের সকল সদস্যরা নিজেদের মত বাড়ি করেছেন তাদের ৫৫ বিঘে জমিদারির মধ্যেই। দুর্গাপুজোর পরিবারের সকলে একত্রিত হয়।

সৃজনী শিল্পগ্রাম ১০ টাকা টিকিট কেটে ঢুকে পড়লেই এসে গেলেন এক মনমুগ্ধকর শিল্পের হাটে। স্থাপত্য শিল্পের এক চমৎকার কোলাজ। নানা রাজ্যের নিজস্ব শিল্পকর্ম রোজকার ব্যবহারের সামগ্রী তাদের দৈনন্দিন কাজের এক টুকরো ছবি তুলে ধরা হয়েছে ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে। ভালোভাবে সময় নিয়ে দেখতে কম করে একঘণ্টা লাগবে।

শান্তিনিকেতন—কলাভবন, ছাতিমতলা, উপাসনা ঘর, রবি ঠাকুরের বাসভবন, আনন্দ পাঠশালা বইয়ের পাতায় যে বটবৃক্ষ আছে সেটিও দেখলাম।

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বাসভবন 'প্রতীচি'।

শালবনী ও পলাশবনী জঙ্গল—প্রকৃতির কোলে কিছুটা সময় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরে চললাম রিসর্টে।

শনিবার মানেই সোনাঝুরি হাট। খোয়াইয়ের হাট নামেও অনেকেই চেনে। সকাল ১০টার পর একজন একজন করে দোকানী হরেকরকম বাহারি জিনিস নিয়ে বসতে শুরু করে সোনাঝুরি আর শালবনীর জঙ্গলের আনাচে কানাচে। তালিকায় থাকে পুঁতির মালা, ডোকরার গয়না, মাটির পুতুল, বেতের জিনিস, বাঁশের কাজ, জামা কাপড়, চামড়ার ব্যাগ, আরও কত কি। বাদ যায় না চপ, মুড়ি, চা, টক দই, ঘুগনী, ওমলেট ও আরও চটজলদি রসনাতৃপ্তির উপাদান।

সূয্যিমামা যতক্ষণ আছেন, হাট চলতে থাকে। বাউলের আখড়া বসেছে, আর তার পাশেই সাঁওতালি গ্রামের মহিলারা তাদের ঐতিহ্যরক্ষার্থে ও কিছু রোজগারের আশায় মাদলের তালে তালে তাদের চিরাচরিত সাঁওতালি নৃত্য করে চলে। মায়াবী এক সন্ধ্যের সাক্ষী হয়ে থাকলাম। পরদিন দুপুর ১১টায় রিসর্ট ছেড়ে বোলপুরের একরাশ ভালোবাসা নিয়ে চললাম বোলপুর স্টেশনে। দুপুর ১.১০এ ট্রেন ছাড়লো কলকাতার উদ্দেশ্যে। ফিরে আসার পথে একটা কথাই মনে হল শান্তিনিকেতন শুধুই ঘোরার জায়গা নয়, এখানকার পথঘাট, গাছপালা সবকিছুর মধ্যেই যে ছন্দ, যে সুর সদাপ্রবহমান তাকে উপলব্ধি করার জায়গাও বটে। মনের মধ্যে অফুরন্ত শান্তি সঞ্চয় করে শান্তিনিকেতনকে বিদায় জানিয়ে কলকাতার রোজকার জীবনে ফিরে চললাম।

ভালোবাসার কবিতামালা ■ সুনির্মল বসু

অসাধারণ জীবনবোধ সম্পন্ন এবং আদ্যন্ত সৎ কবির শিরোপা বিজেতা কবি সুনির্মল বসু কাব্যরীতি ও প্রকরনের চেয়ে পাঠকের কাছে পৌছতে আগ্রহী বেশি—সচেতনভাবেই এবং সেখানে তিনি সফল পুরোপুরি।

অথচ প্রায় বিশ বছর আগে, 'শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ' শীর্ষক উপন্যাস নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পর, তাঁর এই নতুনতর পরিচিত— কোনটি অধিকতর উজ্জ্বল—সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কাব্যকৃতির প্রথম স্বাক্ষর হিসেবে এই শীর্ণকায় কাব্যগ্রন্থটি পাঠকের প্রত্যাশাকে আহত করবে, সন্দেহ নেই।

দু'ফর্মার কৃশকায় কাব্যগ্রন্থ 'ভালোবাসার কবিতামালা'য় মোট আঠাশটি ভালোবাসার কবিতার নির্দ্বিধ সহাবস্থান—অস্বীকার করার উপায় নেই। ভালোবাসার কবিতা—পাঠক লক্ষ্য করবেন 'প্রেমের কবিতা' নয়। কেন না, গ্রন্থের প্রথম কবিতায় কবি জানিয়ে দিয়েছেন, 'শুধু নারীতেই কেন তোমার ভালোবাসা সীমাবদ্ধ থাকবে।' তবু ভালোবাসার একটি সুচারু গাঁথা চমৎকার দৃশ্যমান হয়েছে কবিতাগুলিতে। ভালোবাসার আকুতি অভিমান অনুরাগ বীতরাগ অন্বেষণ বিরহ—যাবতীয় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কখনও স্বগত ভাষণে, কখনও দয়িতার উদ্দেশ্যে মৃদু অনুচ্চ বিরহ—যাবতীয় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কখনও স্বাগত ভাষণে, কখনও দায়িতার উদ্দেশে। মৃদু অনুচ্চ কণ্ঠ সবক্ষেত্রেই উঁচু তারে কথা বলা কবির স্বভাব বিরুদ্ধ। এমনকি, কখনও স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কবিকণ্ঠে ফুটে ওঠে, 'যদি আমায় ভালবাসতে না পারো, তাহলে ঘৃণা করো।' আবার বিপর্যস্ত কবির গলায় 'ক্যামেলিয়া'র (ক্যামেলিয়া নয়, এটা ছাপাখানার ভূতের দান) ফিরে আসা, ভুল স্বীকারের প্রত্যাশার গানও শোনা যায় কখনও। সম্পন্ন জীবনবোধে আস্থাবান কবি 'অঙ্কে কাঁচা, আর গোল্লা হয়েও জীবনের সপক্ষে সার্থক গলা ফাটাতে পারেনা।

শুধু নারী নয়, নিরন্ন মানুষের ভাতের গন্ধ, সময় ও সমাজের বিন্যাস বদলের পাশাপাশি মানুষের মূল্যবোধের বিপর্যস্ততাও কবিকে ভাবায়। পুরোনো দিনের গন্ধ শুধু কবিকে নয়, পাঠককেও স্মৃতিভারাতুর করে তোলে। 'দিনবদল', 'ভাতের গন্ধ', এই অন্ধকার, এই একাকীত্ব' কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শব্দ চিত্রকল্প এবং বাক্‌রীতি লক্ষ্য করলে অস্পষ্ট থাকে না—প্রার সব কবিতাই মোটামুটি এক সময়ের ফসল।

বাক্‌ভঙ্গিমার সহজ লাবন্য, দুরূহতা বর্জিত চিত্রকল্প নির্মাণ কবিকে পাঠকের কাছে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয় অনায়াসে। তবু, কবির মুখে, 'শেয়ালের কণ্ঠে শুনি সিংহের গর্জনে'র মতো তির্যকতা কাব্য পাঠে ভিন্ন স্বাদ বয়ে আনে। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে পাঠক খুশি হন।

মানবতার সমীহ উচ্চারণ কবির সচেতন অভিজ্ঞান। তবু, 'এক অন্ধ ভিখারি গাইছিলেন, মানবিকতা নিলাম হয়ে গেছে গো'—একটু হোঁচট খায় যেন শ্রুতিতে অথচ 'এক ম্যাজিকওয়ালা চিৎকার করে বলছে'—দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকো।

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডলের চিত্রল প্রচ্ছদ, সুন্দর ছাপা সত্ত্বেও প্রযুক্তির রহস্য সামান্য অধরা থাকার ফলে কিছু দৃষ্টিকটু ছাপার ভুল বইটির মর্যাদা খর্ব করেছে বৈকি!

আগামী দিনে কবির একটি পূর্ণায়ব কাব্যগ্রন্থের প্রত্যাশায় থাকলাম। কবিতা তো, সুনির্মলের 'অশ্বমেধের ঘোড়া'।

ভিন্নধর্মী গদ্যের ফসল—দু'টি আখ্যারিকা

স্বপ্ন বদলে যায় এবং আরাফ : প্রভাস ভদ্র সুবর্ণরেখা : কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য : দেড়শো টাকা।

দীর্ঘ বিরতির পর প্রবীণ গল্পকার প্রভাস ভদ্রের মলাটবন্দী দু'টি ছোটো উপন্যাস এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা গেল। অঘোষিত বানপ্রস্থের লেখককে পুনরাবিষ্কারের আনন্দ পাঠকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাঁর মনোযোগের বৃত্তেই লেখকের সহজ দিনযাপন তবু, কত স্মরণীয় নাম দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় নিয়ত—ভাবলে বুকের ভেতর একটি অনিবার্য দীর্ঘশ্বাস মোচড় দেয় বৈকি।

পরিবর্তন চিরকালের ধর্ম। পাকদণ্ডী পথের মতো ইদানিং জীবনের প্রতি বাঁকে লুকিয়ে থাকে মূর্তিমান অভিজ্ঞতা—যার অভিঘাতে কখনও 'বাড়ি বদলে যায়' কারও, কারও 'স্বপ্ন বদলে যায়'—প্রায় অলক্ষ্যে।

মনোযোগী দাম্পত্যের ঘেরাটোপে অবসরপ্রাপ্ত অতীন্দ্র আপাত সফল মানুষ। দুই বিবাহিত সন্তানের পিতা সুখের দেওয়ালে দৃশ্যত ফাটল না থাকলেও, একদা যৌথ পরিবারে বড় হয়ে ওঠা অতীন্দ্রর মূল্যবোধ স্বভাবত এই সময়ের চেয়ে কিছুটা আলাদা একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-সুবিধেগুলো একেবারে লুপ্ত না হলেও, কাহিনির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুটে উঠতে থাকে স্বার্থসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক যাপনবৃত্তে গোপন কৌতূহল। কূট বিষোদগার। অশোভন বাকচাতুর্য। তাই সময়ের নিরিখে নতুন কিছু নয়। গতানুগতিক জীবনের রোজনামচা। স্বপ্নীল দিনযাপনের স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা।

শুধু অতীন্দ্র নন, পারিবারিক চৌহদ্দির বাইরে আড্ডার সমবয়েসী বন্ধুদের অভিন্ন জীবনপ্রবাহে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হন সেবন্তী—অতীন্দ্রর বাল্যবন্ধুর বোন অকালবৈধব্যে ডুবে না যাওয়া সদ্য অবসৃত শিক্ষিকা। অতীন্দ্রর সঙ্গে পুরনো পারিবারিক সম্পর্কের নবীকরণ ঘটে আছে এরই মধ্যে।

বদলে যাওয়া জীবন ও সময়ের পটভূমে প্রায় অভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে সেবন্তী টের পান—সন্তানের মুখাপেক্ষী অবরুদ্ধ মানুষগুলিকে সদর্থক জীবনমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা। সেবন্তীর দ্ব্যর্থহীন প্রণোদনায় স্বনির্ভর অথচ অপাঙতেয়, বাতিল মানুষগুলির স্বপ্ন বদলে যাবার বার্তায় শেষ হয়েছে উপন্যাস। পরিণত লেখকের কুশলী গদ্যে লেখা হালফিল জীবনের ধারাভাষ্য। আত্মোপলব্ধির পাশাপাশি উত্তরণের স্বপ্ন দেখায়—'স্বপ্ন বদলে যায়' উপন্যাস।

'আরাফ' অপেক্ষাকৃত ছোটো উপন্যাস। 'আখ্যায়িকা' বলাই শ্রেয়। একদা অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের আশ্রয় ক্ষেত্র মেটিয়াবুরুজের পটভূমিকায় লেখা। মেটিয়াবুরুজ—কলকাতার মধ্যেই আর এক কলকাতা। শতাংশের হিসেবে বাসিন্দাদের নব্বইজন মুসলমান। লাগোয়া বন্দর আর খ্যাতিসম্পন্ন পোশাকনির্মাণ কেন্দ্রের দৌলতে অঢেল কাঁচা টাকার ঘনিষ্ঠ ব্যাপক অশিক্ষা আর অজ্ঞতার চলা। ওস্তাগর মহল্লায় সেলাইকলের শব্দ। সিস্টেলকল, সুতাকল, সাবুনকল, সিগারেটকলের হরেক কিসিমের মিস্ত্রি, মুনিষ মজুরের স্পন্দমান রক্তমাংসের জীবন।

হিম্মতওলা পুরুষের সাথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পঙ্গু রঙ মিস্ত্রি বাদশার বিবি মদিনার আশনাই। বেটি আয়েসার ওপর টানা মালের চোরা কারবারী ফিকিরবাজ হায়দারের নেকনজর—চেনা গল্পের ছকে অভিনবত্ব না থাকলেও যা আছে এই আখ্যানে—তার মূল্য কম নয়। তা হল, লেখকের ভাষা। পটভূমির সঙ্গে ভাষার এমন সহজ সাবলীল সহাবস্থান সচেতন পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবে গল্প-উপন্যাসের ভাষায় তার প্রেক্ষাপটের প্রভাব স্বাভাবিক ঘটনা বলার কথা, এই স্বাভাবিক বিষয়টি সচরাচর ঘটে না। অথচ 'আরাফ' উপন্যাসে প্রভাস তা কী অবলীলায় ঘটিয়েছেন।

একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। 'ভূতঘাট থেকে দরিয়া কিনারা বরাবর ছিল ফুলফলের বাগিচা। আর ছিল সাহেবদের হাভেলী। ভিতর দিকে দেহাত মানপুর আকড়া মুদিরালি। মনপসন্দ এই শুনশান তল্লাটে কালাপানীতে এলেন অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ। খাল কাটা মাটির পেল্লায় উঁচু টিলা দেখে নাম রাখলেন মেটিয়াবুরুজ, প্রধান পথের নাম কাচ্চি সড়কা।'

অবশ্যই এই ভাষা লেখকের স্বোপার্জিত ধন। যেন পটভূমিই সানন্দচিত্তে দান করেছ লেখককে। লেখক ধন্য হয়েছেন। আমরা, পাঠকেরা কৃতার্থ।

সুন্দর কাগজে নির্ভুল ছাপা—যত্ন ও রুচির বিজ্ঞাপন। স্বকৃত প্রচ্ছদে ফুটে থাকে লেখকের আরও একটি সত্তা।

■ **অনুপ কুমার আচার্য**

Krishanu Quarterly
Vol XXXXXII/II&III
Rs. 150.00
Regd No. R. N. 16533/68

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচিত সহজ পাঠ গানে গানে

সহজ পাঠ সহজ গান

সহজ পাঠ-এর আঠেরোটি কবিতা
সুরে সুরে গানে গানে ...

সুর ও পরিচালনা — মদন দাস

কণ্ঠ — বউল দাস

সহশিল্পীবৃন্দ :
দেবারতি ভট্টাচার্য, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সায়নীতা রায়, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়,
মৌসুমি নাথ ও শিপ্রা দে।

শোনার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
www.archive.org/details/SahajPath

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও
লোনস্টার সল্যুশনস, ৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।